ডুবোজ্বর

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

ডুবোজ্বর

ডুবোজ্বর
নির্ঝর নৈঃশব্দ্য
dubojwar
by
nirzhar noishabdya
01717619286
nirzharnoishabdya@gmail.com
www.nirzhar.blogspot.com

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমলো ২০১২

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
লেখক

প্রকাশক
ইবরাহীম মুহাম্মদ
ঋতবর্ণ প্রকাশন, কক্সবাজার
01612206206
ritobarno@gmail.com
www.ritobarno.blogspot.com

দাম
৬৪ টাকা

ISBN 978-984-33-3062-4

দোয়েলমণি
আমার সবচে' ছোট্ট বোনটি
উনিশবছর পর যে পুনর্বার আকাশের পাখি হয়ে গেলো

গল্পক্রম

জ্যামিতি বই ০৭
উল্টাটান ১১
রঙটানা ১৪
গোপন রুমাল ১৬
হাওয়াচুর ২১
ডুবোজ্বর ২৪
বটফুল ২৯
অন্ধনথ ৩২
বেহালার বাক্স ৩৫
ঝাঁপতাল ৪০
করাতিয়াক্যাম্প ৪৪
ছায়ার ডানা ৪৯
নদীমদ ৫১
প্রিয়তম দুঃখ ৫৪
হেল্পিংহ্যান্ড ৬১

জ্যামিতি বই

আমাদের জন্ম এক অর্ধমিথ্যা কুসুমকুমারের ঘুমহীন মাথার ভিতর। আমাদের জ্যামিতির একটি স্যার আছে। আমাদের বুড়োর বাগান আছে। আমাদের আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, কমলা, নাশপাতি, কলা, কদুলিবন ইত্যাদি আছে। আমাদের সে আছে সুতোচুর থালাবাসন, মলিন রেকাব। আমরা চপল এবং হিরণ্ময় দ্যুতি নিয়ে ঘুরে বেড়াই। আমাদের পরনে ইশকুলের শাদা জামাজোড়া ভাঁজতোলা। শাদাজামায় জামের রস। দুইজায়গায় দাগ। আর আমাদের কুসুমকুমার নির্ঘুম আনন্দগান।

আমাদের নতুন জ্যামিতি স্যার এলো শ্রেণিঘরে। আমরা মাঝে মাঝে ভুল করে লিখি নবমশ্রোণি। স্যার চিল্লায়, শ্রোণি মানে কী জানো?
আমরা ফিক করে হেসে ফেলি, কী স্যার?
স্যার হাদার মতো তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, জ্যামিতি বইয়ের নবমপৃষ্ঠা খোলো।
আমরা একে একে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে একটা করে ত্রিভুজ এঁকে দিয়ে বেরিয়ে যাই। ক্লাসে স্যার দাঁড়াতে দাঁড়াতে বসে যায়।

স্যার জ্যামিতিতে কাঁচা।

আমরা বুড়োর বাগানে ঢুকে পড়ি।
কে লো?
তুমি এখনো মরো নাই বুড়ো?
মুই মলে তো তোরা সব লুতেপুতে খাবি লে ছালি...
বুড়ো ছড়িহাতে আমগাছের ডালে বসে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আমরা বাগানের আম, জাম, কলা, কলাপাতা ইত্যাদি খেয়ে বেরিয়ে পড়ি।

আমরা ভূতে বিশ্বাস করি না।

বাজারে দুইটা ঢেউটিনের বাগান আছে। আমরা বাজারে গিয়ে টিনের বাগান তছনছ করি। দুইহাতে বাজাই আর আটহাতে টিন কাটি। টিনবাগানের পাশেই কাচের আড়ত। আমরা আড়তে ঢুকি। আমাদের প্রত্যেকের আঙুলই তখন হিরের ক্ষুর। তারপর আমরা অফিস, বাড়ি, জাদুঘর সবখানে ঢুকে জানলার কাচগুলি ফালি ফালি করে কেটে দিই। আমাদের আনন্দ হয়।

আমরা জানতাম একটা কাচকাটা ক্ষুরের দাম একশোবাষট্টি টাকা নব্বইপয়সা।

আমরা একটা কালীমন্দিরে ঢুকে পড়ি। মায়ের পাথরের লকলকে জিব ধরে টানাটানি করি। নরমুণ্ডে আদর বুলাই, বুকে চেপে ধরি। আমাদের বুক ক্রমশ স্ফীত হয়। টনটন করে। মা হাসে। তার হাসিতে নৈঃশব্দ্য ছাড়া কিছুই ঝরে না। আমরা এদিক-ওদিক তাকাই। রাস্তায় পাড়ায় কাউকে চোখে লাগে না। আমরা সন্তর্পনে দরজা লাগাই। জানলা লাগাই। সব মোমবাতিগুলি সব জ্বালিয়ে দিই। পিলসুজের নিচে ভয়ানক অন্ধকার জ্বলতে থাকে। আমরা ডরাই না।

আমাদের সাথে সে আছে। মোমের আলোয় তার কাঁধের দিকে আমাদের সকলের চোখ যায়। কাঁধে তার জ্বলজ্বল করছে কাঁচুলির ফিতা। আমার মজা পাই। সে বুঝতে পারে। কেমন করে তাকায়। আমরা তার জামা ধরে টানা-টানি করি। একে একে তার সব জামা ছিঁড়ে ফেলি মহান উল্লাসে। সে দুহাতে তার চিহ্ন আড়াল করে নতমুখে বসে থাকে। তার বুক থেকে গড়িয়ে পড়ে একজোড়া কমলা। আমরা অবাক হই না। আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হিহিহিহিহিহি করে হাসি। কমলা দুইটা খুলে খেতে খেতে বেরিয়ে আসি।

ইশকুলের ক্লাসে সে আর আমাদের সাথে বসে না। আমাদের সে ছেলেদের সাথে বসে। মৌলবি স্যারের ক্লাসে মাথায় টুপি পরে বসে থাকে। মৌলবি স্যার বলে, তুই কি নতুন আইছস? নাকি কেলাস করস নাই।
সে নতমুখে কাঁপতে থাকে। কিছু বলে না।
হিহিহিহিহিহিহিহিহিহি আমরা হাসি। মৌলবি স্যার আমাদের দাঁড় করায়।
আমরা দাঁড়িয়ে বলি, হুজুরে কি দাড়িতে মেহেন্দি দিছেন? সোন্দর লাগে হিহিহিহিহিহিহি...
মৌলবি স্যার রাগে কাঁপতে থাকে কিছু বলে না, ইশারায় আমাদের বেঞ্চে দাঁড়াতে বলে।
আমরা দাঁড়াই আর কিছু বলি না তবে আমাদের হাসি বাড়তে থাকে
হিহিহিহিহিহিহিহিহিহিহিহি...
মৌলবি স্যার আমাদের হাই বেঞ্চে দাঁড় করায়
হিহিহিহিহিহিহিহিহিহিহিহিহিহিহিহিহি...
পাঁচ কলমা ক
হি...
তিনি আমাদের পিঠে দুইটা বেত ভাঙেন। আমাদের হাসি বাড়তে থাকে। তিনি দৌড়ে অফিসে গিয়ে আরো পাঁচটা বেত নিয়ে আসেন।
হি...
তিনি পাঁচটা বেত আমাদের পিঠে ভাঙেন। আমাদের শাদাপিঠ লালপদ্ম হয়ে ফোটে। আমরা হাসতে থাকি।
ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা পড়ে। তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে হিস্টিরিয়াগ্রস্থের মতো বেরিয়ে যান। আমরা হাসতে হাসতে দেখি- আমাদের সে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে পৃথিবীর সমস্ত বর্ষা এসে ছাপিয়ে পড়ছে। আমরা অবাক হই। আমাদের হাসি থেমে যায়।

আমাদের শহরতলিতে একপাল জানোয়ার নেমে আসে। বুড়োর বাগানের আনারস সব করাত দিয়ে কাটে। ভূতটাকে একটা বোতলে ভরে এগারোহাত মাটির তলায় পুতে ফেলে। আমাদের ইশকুলে ঢুকে পড়ে। বাথরুম নোংরা করে। লাইব্রেরিতে ঢুকে বইপত্র ছিঁড়ে ফেলে। আমাদের মৌলবি স্যার আর জ্যামিতি স্যারকে ধরে নিয়ে যায়। দুইদিন আটকে রাখে। তারপর খোজা বানিয়ে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর এক বিষুদবারের হাটে কেজি দরে বিক্রি করে দেয়।

আমরা হাসতে গিয়ে মনখারাপ করে বাড়ি ফিরি।

আমরা পলাশবনে, অশোকবনে, কৃষ্ণচূড়ার বনে, শিমুল আর পারিজাতের বনে গাছের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিই। জানোয়ারগুলি মনে করে বুঝি বসন্ত। তারা বনের দিকে ছুটে যায়। গাছে চড়ে ফুল পাড়তে গেলে তাদের নখ আর লোম পুড়ে যায়। তাদের চোখে ছানি পড়ে। তারা জান্তব চিৎকার করে গাছ থেকে খসে পড়ে। এবং আমাদের পাড়ার দিকে আসতে থাকে। আমরা তাকিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা ডরাই না।

জানোয়ারগুলি আমাদের পাড়ায় ঢুকে পড়ে। আর যখন আমাদের ফুফু এবং খালাদের পা ধরে টানে আমাদের মাথায় রক্ত উঠে যায়। আমরা ইশকুলের ধারের রক্তজবার ঝাড়ে লুকিয়ে পড়ি। এবং গুলতি দিয়ে জানোয়ারগুলির চোখে ধুতুরার বিষমাখা মার্বেল ছুঁড়ে মারি। অচিরেই জানোয়ারগুলি চোখ হারায়। আমরা জানোয়ারগুলিকে নিয়ে খেলি। খেজুরের কাঁটা দিয়ে চারপাশ থেকে খোঁচাই। বেতের কাঁটা দিয়ে করাতের মতো কাটি। জানোয়ারগুলি আক্রোশে তড়পায়। আমাদের দেখতে পায় না বলে কিছু করতে পারে না। আমরা ঘর থেকে বটি নিয়ে আসি। জানোয়ারগুলির সামনের লেজসমস্ত কেটে দিই। তারপর পিটিয়ে মেরে ফেলি। এবং ফালি ফালি করে কাটি। কেটে রান্না করি। ভোজসভা চলে দুইদিন ধরে। শহরতলির লোকজন বাসমতি চালের রুটি দিয়ে সেই মাংস মহা আনন্দে কব্জি ডুবিয়ে খায়। আমরা হাসি। আমাদের সে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। সেও হাসে হা হা হা হা হাহাহাহা...

আমরা সব একসাথে থাকি। একই শয্যাবাস। পরস্পরের চুল বেঁধে দিই। নখ কেটে দিই। খাইয়ে দিই। কাপড় কেচে দিই। ত্বকে হলুদ লাগিয়ে দিই। চুলে আমলকি, মেথি ও মেহেদি লাগিয়ে দিই। চোখে কাজল টেনে দিই ইত্যাদি। আমরা পরস্পরকে রক্তের ভিতর টের পাই। আর রক্তের ভিতর টের পাই আমাদের তাকে।

আমাদের সে আমাদের সাথে থাকে না। তবে সে আসে কোনো কোনো দিন বৃষ্টির ভিতর। আমরা তাকে দিই এলাচির বন। সে এলাচির বোঁটায় মুখ রেখে পাগল হয়ে যায়।ঘ্রাণের উৎস

খুঁজে বেড়ায় উন্মাতাল। আমরা তাকে আমাদের সমুদ্রে নিয়ে যাই। আমরা তাকে আমাদের নদীতে নিয়ে যাই। সে নুনের ঘ্রাণ শুকে পাগল, সে পলিমাটির নির্যাসে পাগল। সে তরলমেঘের আস্বাদে পাগল। আমরা তাকে মুঠোর ভিতর দিই মখমল মেঘ। সে মুঠো খুলে পাগলের মতো মুখে নেয়। আমরা তাকে আঙুলের ফাঁকে গুজে দিই শঙ্খের রাত। দুআঙুলে তুলে সে তা ওষ্ঠাধরে নেয়। আমাদের শঙ্খ ক্রমে সূর্যকে ম্লান করে দেয়। আমরা তাকে দিই ঝিনুকপাখি। সে দংশনে তাকে মুক্তো বানায়।

একদিন আমারা দ্বিগুণ হয়ে উঠি।

বছরের পর বছর কেটে যায়। আমরা রক্তজবার ঝাড়ে মিনার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আমাদের তারা ইশকুলে যায়। জ্যামিতির নতুন স্যার আসে। আমাদের জানতে ইচ্ছে করে– আমাদের তারা জ্যামিতির ক্লাসে কী করে। আমরা চুপিচাপ প্রজাপতি হয়ে উড়ে ক্লাসে ঢুকে পড়ি, আমাদের তাদের জ্যামিতি বইয়ের নবমপৃষ্ঠায় ঢুকে ত্রিভূজ আর ট্রাপিজিয়াম হয়ে যাই। পৃষ্ঠা ফাঁক করে স্যারের দিকে তাকাই। জ্যামিতি স্যারকে দেখে অবাক–বিস্ময়ে মাছ হয়ে যাই।

আমাদের তারা আমাদের মতোই যথারীতি হিহি করে। খাতাতে লিখে রাখে নবমশ্রেণি। জ্যামিতি স্যার খেয়াল করে। তাদের দাঁড় করায়।
কী লিখেছো? দেখাও।
তারা খাতা এগিয়ে দেয়।
শ্রেণি মানে কী জানো?
আমাদের তারা হিহি করে হাসে, কী স্যার?
জ্যামিতি স্যার শ্রেণি কী, কী কাজ বিস্তারিত বলতে থাকে তাদের চোখের ভিতর তাকিয়ে। তারা লজ্জায় চোখ নামায়।
জ্যামিতি স্যার বলে, আসো এইবার একটা করে ত্রিভূজ আঁকো।
জ্যামিতি স্যার দাঁড়িয়ে থাকেন। দাঁড়িয়েই থাকেন। ঘণ্টা পড়ে। তিনি দাঁড়িয়ে...
আমাদের তারা স্যারের দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে যায়।

ঘোর কেটে গেলে আমরা সমুখে আমাদের সেই অর্ধমিথ্যা কুসুমকুমারকে দেখি।

উল্টাটান

বাইরে ভোর হচ্ছে। তার তন্দ্রামতো এসেছিলো, তন্দ্রার ভিতর বারবার সে একই স্বপ্ন দেখছিলো। স্বপ্ন না দুঃস্বপ্নই হবে। এই চরে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে। আর জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, নৌকো, কলাগাছ, বকফুল, গরুছাগল, হাঁসমুরগি আর লাউয়ের মাচাং। আর তার বাচ্চাটার জামার একটা অংশ একটা নিমগাছের ডালে আটকে আছে। আর বাচ্চাটা কাঁদছে। কিন্তু তার কান্নার শব্দ ঢাকা পড়েছে ঝড়ের শব্দে। জায়নামাজের মতো লাল একটা শাড়ি উড়ে যাচ্ছে দেখলো নিমগাছের পাশ ঘেঁষে। তার মনে হলো এটা জরিনার পরনে ছিলো। স্বপ্ন আর বিস্তারিত হলো না, ফজরের আযানের শব্দে তার তন্দ্রা ছুটে গেলো।

ইদানীং প্রায় রাতে সে এইসব হিজিবিজি স্বপ্ন দেখে। রাতে ঘুম হয় না। তন্দ্রামতো হয়। সে বিছানায় পড়ে আছে প্রায় দুইবছর হতে চললো। এবং প্রতিদিনই বাইরে ভোর হয়।

নদীতে নতুন চর জেগেছিলো সেবছর। মানিকের পাল্লায় পড়ে সেও চর দখলে গিয়েছিলো। এই চরের মারা পড়েছে দুইজন। সবচে বড় লাঠিয়াল হাসমত। আর তার সাগরেদ মানিক।

লাঠির আঘাতে তার ডান পা থেতলে গিয়েছিলো। ওরা হাসমত আর মানিকের লাশের সাথে তাকেও উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। হাসমতের লাশের কী হলো সে জানে না। মানিকের লাশ যখন টুকরো টুকরো করে কেটে ভুষি আর খড়ের সাথে গরুকে খাইয়ে দিলো তখনও সে নির্বিকার, কেবল একটু বমি বমি ভাব হয়েছিলো। যখন সাড়ে তিনদিন পর ওরা তার কাছে এসে বললো, অ মিয়া! এমুন ভাঙা পাডি দিয়া তুমার কাম কী? এইডা হইলো বুঝা... বলেই ভুজালির কোপে হাঁটুর উপর থেকে তার থেতলানো ফোলা ডান পাটা কেটে ফেললো তখনও তেমন ব্যথা পেলো না। ওই পায়ে কোনো চেতনা ছিলো না। মনে হলো শরীর ভারমুক্ত হলো। তার অবাক লাগলো। কিন্তু যখন তার পাটা তার সামনেই টুকরো টুকরো করে কেটে ভুষি আর খড়ের সাথে গরুকে খাইয়ে দিলো তার বমি হলো, এবং সে বমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেলো। তার জ্ঞান ফিরলো তার ঘরের বিছানায়। তার মুখের ওপর জরিনার নির্লিপ্ত মুখ। জরিনা তাকে কিছু বলে নি। পরে শুনেছিলো তার অজ্ঞানদেহ চরে পড়েছিলো। লালু তাকে প্রথম আবিস্কার করে। এবং চরে জানাজানি হয়। সেবছর এইচরের লোকজন নতুনচর দখল করতে পারে নি।

জরিনার হাসির শব্দ শুনে সে। ভাবে, মাগী কি রফিক্যার লগে হাসে, হের লগে কী চলতাছে? ভাবে, মাগীডা খায় কী, দিন দিন এমুন সোন্দর হয় কেমতে? তার সবকিছু অসহ্য লাগে সে মাথার উপর বালিশ চেপে ধরে বিছানায় গড়াগড়ি খায়।

দিন পাল্টে গেছে। এখন সেই প্রেম আর নেই। অভাব আর পঙ্গুত্ব সব কেড়ে নিয়েছে তার

জীবন থেকে। এই দুইতিনবছরে জরিনা তার বিছানায় দুইয়েকবারও আসে নি। সে এখন শাশুড়ির ঘরে থাকে। শাশুড়ির মরার পর থেকেই জরিনা ওইঘরে থাকে ছেলেটাকে নিয়ে। এখন একা থাকে। ছেলেটার যখন চারবছর বয়স তখন তাকে রফিকের হাফেজখানায় রেখে আসে। ওখানে আরো ছেলেরা থাকে খোঁপখোঁপ ঘরে। জরিনা দুইদিন পরপর গিয়ে দেখে আসে।

তার শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। আরেকটা পাও নীল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এখন শুধু খিটিমিটি লাগে। সে কারণে অকারণে জরিনাকে ডাক দিয়ে অশ্রাব্যভাষায় গালিগালাজ করে। জরিনা চুপ করে শোনে।

দরজায় ঠক ঠক শব্দ হয়। দরজা ভেজানো তারপরও শব্দ। সে কথা বলে না। অসহায় চোখে দরজার দিকে তাকায়। সে বাতাসকে মনে মনে বাপান্ত করে। তারপর তার মনে পড়ে লালুর কথা। ভাবে, লালু নাতো! এ কুকুরটা তার কাছে মাঝে মাঝে আসে, মানুষের মতো তার সাথে কথা বলে, প্রথমে সে অবাক হয়ে ভাবতো, কুত্তা কেমতে কথা কয়? তারপর মনে হলো, সবডি আল্লার খেল...। যখন থেকে সে ঘরে একা একা থাকে– একদিন লালু এলো। কুকুরটাকে দেখে তার ভালো লাগে এটা বলতে গেলে তার প্রাণ রক্ষা করেছিলো। সে ভাবে, আল্লার অছিলা। দরজা ঠেলে লালু ঢুকে ঘরে, মিয়াভাইয়ের শইলডা কেমুন?
ভালা নারে! তুই খাইছোস কিছু?
আমারে নিয়া ভাবতে অইবো না। আমার খাওনের অভাব নাই।
আইজগা কী খবর লইয়া আইলি?
মিয়াভাই চরে লাখে লাখে পিঁপড়া ঢুকতাছে। এইডা ভালা লক্ষণ না।
হ। আমি কদিন ধইরা খারাপ খোয়াব দেখতাছি।
তুমার শইলতো শুকাইয়া যাইতাছে শুটকি মাছের লাহান।
হ।

তার কান্না পায়। সে গোঁ গোঁ করে কাঁদে আর বিছানায় গড়াগড়ি করে। লালু দরজা ঠেলে বের হয়ে যায়।

ভরদুপুর। জরিনা ভাবে, রফিকভাইজান না থাইকলে যে কী অইতো? সে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে। সে ভাবে, সারাজীবন মানুষডা আর বিয়াও করলো না। আমার লগে বিয়া হইলে তো... সে আর ভাবতে পারে না, একটু লজ্জাও পায়।

সারাদিন কিভাবে কেটে যায় জরিনা বুঝতেও পারে না। সারাদিন কাজ করতে হয় এ বাড়িতে। অনেক বড় বাড়ি। নদী পার হয়ে প্রতিদিন এই বাড়িতে আসে সে। স্বামী পঙ্গু হওয়ার পর থেকেই সে বাড়ি বাড়ি কাজ করে। এবাড়িতে কাজ করছে তাও আটনয়মাস হয়ে গেছে। করিমের বয়স সাড়ে চারবছর। আপাতত করিমকে হাফেজখানায় দিয়ে দিয়েছে। অইখানে সে থাকে। কোনো টাকা পয়সা দেয়া লাগে না, হাফেজখানাটা রফিক চালায়। সে

জরিনার দুর সম্পর্কের ভাই। বছরদেড়েক হলো সে এই চরে এসেছে। জরিনার স্বপ্ন ছেলেকে ভালো স্কুলে পড়াবে, শহরে পাঠাবে। সে ভাবে, করিমের বাপের পাড়া ভালা থাইকলে তার আর চিন্তা থাইকতো না। এইসব কথা মনে হতেই তার চোখ ফেটে পানি আসে। সে আঁচল চোখে চেপে ধরে।

এই বাড়িতে জরিনা সারাদিন গরুর জন্যে খড়বিচালি কুটে, ভুষি মাখায়। গোয়াল ঘরে এগারোটা গরু। দুইটা গরু গাভীন। সে কাজ করতে করতে হঠাৎ তার গোয়াল ঘরের একটা কড়ি কাঠের দিকে চোখ যায়। একটা পেরেকে ঘুনষির সাথে ঝুলতে থাকা একটা মাদুলির দেখতে পায়। খুব পরিচিত লাগে। সে হাতে নেয়। সে চিনতে পারে চর দখলের ঘটনার আগেও এটা স্বামীর কোমরে বাঁধা ছিলো। হঠাৎ করে তার কী যেনো হয়ে যায়, সে কাঁদে না, চোখ দিয়ে তার আগুন বের হতে চায়। সে গাভীন দুইটা গরুকে পাশ থেকে একটা চেলাকাঠ তুলে নিয়ে নিঃশব্দে পেঠাতে থাকে। সে যেনো বোবা হয়ে যায়। বাতাস ভেসে বেড়ায় কেবল হাম্বা হাম্বা চিৎকার।

তার ঘুম ভেঙে গেলো। সে ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসতে গেলো পারলো না। তার শীর্ণকায় পঙ্গু শরীর দোলে উঠলো। একপাশ ভিজে গেলো। চৌকিটা কাত হয়ে ডুবে যেতে গিয়েও আবার ভেসে উঠলো। শেষবার যখন চৌকিটার একপাশ ভাঙলো তখন জরিনা দুইপাশে দুইটা বাঁশ বেঁধে দিয়েছিলো বলে আজ রক্ষা। একটা ঢোরাসাপ তার কাটা পায়ের কাছে কুণ্ডলি পাকিয়ে চুপিচাপ শুয়ে থাকে। সে শক্ত হাতে চালটা আঁকড়ে ধরে থাকে। কিন্তু সহসা প্রচণ্ড দমকা বাতাস এসে চালটা উড়িয়ে নিয়ে যায়। সে আকাশের দিকে দিকে তাকিয়ে থাকে, সে ভাসতে থাকে জলস্রোতে। সে ভাবে, এমুন ঢল বাপজানের দাদার আমলেও হয় নাই। তয় হুজুরে কইছিলো নুহনবীর আমলে চল্লিশদিন ঢল অইছিলো দুনিয়ায়। সে তার চৌকিটাকে নুহের নৌকা মনে করে স্বস্তি পায়। কিন্তু তার সেই দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়...

রঙটানা

ধানক্ষেতের আইল ধরে গেলে গ্রাম মেলে এমন কথা বলা যায় না ইদানীং। তারপরও ছায়া ছায়া গ্রাম আছে রোদের ছায়ায়। মক্তবে আমপারা ছেড়ে আম পাড়ায় ব্যস্ত বালক দেখে বাপের কবর ঢেকে গেছে কুমারীঘাসে, ঘাসের ঠোঁটে এখনও শিশির আবেশে থরথর সূর্যের চুম্বনে। তাদের দুইটি ছাগল; একটা কালো, অন্যটা বাদামি। মা বলেছে, ঘাস কেটে আনবি... ঘোড়া কিংবা গাধার জন্যে নয়– বাপের কবর নিড়িয়ে বালক ঘাস কেটে ঘরে ফেরে ছাগলের জন্যে।

ধানক্ষেতের আইল ধরে গেলে তারপরে গ্রাম। গ্রামের নাম নাই। মক্তব আছে একটা। আছে বিধবার খড়ের চালা একফালি ঘর। ঘরের পেছনে একটু দুরে জঙলার ঝাড়, ঝাড়ের ছায়ায় শুয়ে আছে নীরবে ঘাসে ঢাকা তরুণ কবর। আর একটি বালক ঘাস কাটে আরও নীরবে। মাতৃভাষা সে শিখেছে ঢের। তাই আমপারা ছেড়েছে সে সেই বৈশাখে– একটি ফলবতীগাছের তলে দাঁড়িয়ে একা।

আবারও বৈশাখ। ঝড়ের প্রতীক্ষায় অস্থির বিধবার খড়ের চাল। আর বালক আমপারা ভুলে– ঘাস কাটা সেরে দাঁড়িয়েছে এসে আমগাছটির তলে। কাঁচা-পাকা আম দেখে ভাবে রামধনু, ভাবে লালপাড়-সবুজশাড়ি, ভাবে মা, ভাবে বিধবার শাদা-থান, ভাবে রামধনু, ভাবে ভোরের আযান, ভাবে শঙ্খনাদ, ভাবে গান, ভাবে গান...

ঘাস কাটা ছেড়েছে বালক সেই বৈশাখে। আষাঢ়ের প্রথম দিবস। মেঘেরা রামগিরি থেমে চলেছে অলকা অভিমুখে। বালক দাওয়ায় শুয়ে দেখে দুপুর আকাশ, মেঘে মেঘ লেগে আরক্তিম খেচর। সে উঠে বসে, আবার শোয়, উঠে, হাঁটে, পুকুর ঘাটে দেখে মা, পুকুরের জলে দেখে মায়ের চাল ধোয়া শাদা হাত উঠা নামা করে...

রাতে সে মায়ের কান্না শুনে। রাতে সে মায়ের ব্যাকুলতা দেখে। রাতে সে মায়ের শূন্যসিঁথি দেখে। আর শেষরাতে দেখে ব্যাপ্তশূন্য উঠানে আষাঢ়ের গাভীনবৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে রজঃস্বলা মায়ের অশ্রু, শূন্যতা, স্রাব, সমস্ত জন্মদাগ...

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক...
ধানের গন্ধে রাতদিন জেগে থাকে বালক, জেগে জেগে সে বুঝে– জেগে আছে প্রিয়তম ভুল, শাদাশাড়ি গন্ধের জোনাক বকুল...

গোধূলি এসে পুকুরে নেমে শুয়ে আছে ধীরে। বালক উঠানে এসে ডাকে–
মা–আ... মা–আ...
কী গো বাজান?
হাটে যাই
যাও বাজান, তয় তাড়াতাড়ি আয়া পড়বা, আমার ডর করে...
আইচ্ছা মা...

ধূলিধূলিপথ হেঁটে বালক হাটে এসে দাঁড়ায়। এদিক–ওদিক তাকায়, তারপর কোমর থেকে একটানে ছিঁড়ে নেয় কালো ঘুনসি, ছিঁড়ে ফেলে পনেরোবছরের সুতোসখিকে; ঘুনসি থেকে খুলে নেয় রূপার মাদুলিখানি। তারপর স্যাকরার দোকানে ঢুকে টাকা কটা গুনে নিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপরে ঢুকে কাপড়ের দোকানে, কাপড়ের দোকানে রামধনু আর রামধনু পরস্পর সহবাসে তখন হয়ে আছে আনন্দ গান...

একদিন বালক মায়ের সমুখে গিয়ে দাঁড়ায়। দেখে মায়ের একটা চুলও শাদা নয়, কেবল শাড়িটাই শাদা। সে বিধবার চোখের ভিতর তাকায়। মা চমকে উঠে–
কী দ্যাখো, বাজান?
বালক তার পেছনের হাতখানি সমুখে আনে, তার হাতভর্তি একটা শাড়ি, শাড়িটার রঙ লাল।

গোপন রুমাল

তখনও সেই অভিজ্ঞতাটা আমার হয় নি। আমি ভাবছিলাম আকাশের রঙ কেমন করে নীল হয়, কেমন করে উদ্ভিদ। অথবা কেমন করে, কেন বা ফণা তোলে দেহের ধনেশ। তাকে বলতেই সে বললো, তবে চল যাই।
অবাক হলাম। সে কি তৈরি ছিলো? আমি স্কেচখাতাটা সঙ্গে নিলাম।
ওটা আবার কেনো?
তারপরও আমার মূল কাজ তো ছবি আঁকা, তাই না?
সে হাসলো।
আমরা একটা ইঞ্জিনবোটে চড়লাম। আর ঢেউগুলি কাঁপছিলো জলের সাথে। কেমন এক অস্থিরতা কাজ করছিলো আমার ভিতর...

ঘাটে নেমে আমার বুকে ভিতর ধক্ ধক্ করতে লাগলো।
চল্, হেঁটেই যাই।
কেনো? রিকশায় গেলে ক্ষতি কী?
না, রিকশা নেয়া যাবে না। সে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলো।
কাহিনিটা কী, বলতো।
রিকশা নিলে রিকশাঅলা সোজা নিজের ঘরে নিয়ে যাবে...
তার কথা শেষ না হতেই আচমকা কথাটা আমি বুঝতে পারলাম। কেনো জানি আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো।
চল্ ফিরে যাই, আর যাবো না।
আরে! চল্ চল্, বেশি দুর না, আর মাইলখানেক গেলেই হবে।
না দোস্ত, সেজন্যে নয়, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না আর।
কেনো, অভিজ্ঞতার দরকার আছে না!
ভালো লাগছে না।
আচ্ছা, তোর অভিজ্ঞতার দরকার নাই। খাতা নিয়েছিস সাথে, গোটাকয়েক স্কেচ কিংবা ড্রইং তো করতে পারবি।

আমি আর কিছু বললাম না। চুপিচাপ হাঁটছি। সূর্যটা মাথার উপর হতে নেমে যাচ্ছে। আমাদের ছায়াগুলি ক্রমশ শরীর থেকে নামছে রাস্তায়। আমি ভাবছি এখানকার রিকশাঅলাদের কথা।

আমরা হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে পার করছি ধুলি, কাদা, ভাঙা-রেললাইন, বাঁশবন, মসজিদ, মন্দির, কাঁটাঝোপ, মানুষজন...

একটা সাঁকোর মুখে এসে দাঁড়ালাম আমরা দুজন।
দোস্ত, পুলসেরাত আইসা গ্যাছে।

আমি বাঁশের সাঁকোটার দিকে তাকিয়ে আনমনা ছিলাম।
পুলসেরাত মানে? বলে নিচের মরা খালটার দিকে তাকালাম।
হ্যা তো, দ্যাখ! অইপারে বেহেস্ত... বলেই সে হা হা করে হাসলো।

আমি সাঁকোর ওপারে অনতিদুরে পাড়াটার দিকে তাকালাম। সারি সারি দোচালা ঘর, টিনের, বেড়া বাঁশের। চালের উপর গোটাপঞ্চাশেক এন্টেনা, টেলিভিশনের। মনে হচ্ছে হাট বসেছে। লোকজন গমগম করছে।

আমরা সাঁকোটা পার হলাম। সাঁকোর মুখে টোলবাকশো নিয়ে একজন বসেছিলো। সে দুজনের কাছ থেকে পনেরো পনেরো মোট তিরিশ টাকা নিলো।
এই শেষ, আর দিতে হবে না?
নারে দোস্ত, সবে শুরু...

আমরা পাড়ায় ঢুকলাম। আমার সহসা কুরবানির হাটের কথা মনে হলো।

বাঁশের ঘরগুলির মতোই মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, হাসছে, দুলছে, কথা বলছে...। চৌদ্দ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে সব বয়সের মেয়েই আছে। বয়স্কদের পরনে শাড়ি আর অন্যদের পরনে সালোয়ার-কামিজ। কড়া সাজগোজ কারোর মধ্যেই নেই।

দোস্ত, তুই দাঁড়া, আমি কথা বলে আসি। সে সামনে এগিয়ে গেলো। মাঝবয়েসি একজন মহিলার সাথে কী যেনো বললো। মহিলা আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমার অসুস্থ লাগছে। কেমন অস্থির লাগছে। মাথার দুপাশের শিরা দপ্ দপ্ করছে।

মহিলাটি হাত ধরে আমাকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিলো। বললো, যাও ভাই, তুমিও নতুন, মাইয়াডাও নতুন; তয় একটু দেমাগি আছে মাগি। বলে সে চলে গেলো। আমি দরজাটা ভিজিয়ে দিলাম শুধু, কেনো জানি খিলটা লাগালাম না। আমার হাত কাঁপছিলো তখনো। ঘরের আসবাব বলতে একটামাত্র বক্সখাট। ঘরের এককোণায় একটা টেলিভিশন, সাথে একটা ডিভিডি প্লেয়ার। জানলাটা দক্ষিণের বেড়ায়, এবং বন্ধ। আমার ঝাপসা চোখ ঘুরে এসে পুনরায় মেয়েটির উপর স্থির হলো। এইবার ভালোভাবে খেয়াল করলাম তাকে। খাটের এককোণায় হাঁটুতে মুখ গুজে বসে আছে। দেহটা মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে কি কাঁদছে? এই কথাটা আমার মাথায় আসতেই আমার সমস্ত অস্থিরতা, সংকোচ, কামনা, ভয় মুহূর্তেই নিভে গেলো। তার জায়গায় একধরনের সরল আলো এসে আমাকে ভরিয়ে দিলো। আমি জানলাটার কাছে গেলাম। জানলার খিলটাতে জং ধরে গেছে। অনেকদিন খুলে নি কেউ এই জানলা, হয়তো কোনোদিন, একদিনও না। আমি অনেক কষ্টে যে-ই জানলার কপাট খুলেছি, যে-ই এক পশলা বাতাস এসে ভরিয়ে দিলো ঘরের শূন্যতা– মেয়েটি অকস্মাৎ মুখ তুলে হাহাকার করে উঠলো, না... না...
আমি তার সমুখে গিয়ে দাঁড়ালাম।
ভয় পেয়ো না। আমি তোমার সাথে এমন কোনো আচরণ করবো না, যা তোমার জন্যে অপমানকর, যাতে তুমি লজ্জা পাবে...
আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার ভিতরের পশুটিকে হত্যা করে মানুষটি উঠে দাঁড়িয়েছে।

মেয়েটি আমার দিকে অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে কথাগুলি শুনে। তার বিস্ফারিত চোখে যেনো থেমে গেছে মহাসমুদ্রের বিশাল ঢেউগুলি। বাতাসে এখনো কাঁপছে তার একপাশের চুল। শ্যামল গড়ন কেমন ভাসা ভাসা চোখ! তাকে কেনো জানি বোনের মতন মনে হলো। ইচ্ছে হলো তার চুলে হাত রেখে আদর করে দিই। বয়স চৌদ্দ-পনেরোর বেশি হবে না। একটা বাদামি রঙ তাঁতের শাড়ি কোনো রকমে শীর্ণদেহে পেঁচিয়ে রেখেছে। ফোলাচোখ দেখে মনে হলো অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে।

পরিবেশটা হালকা করার জন্যেই আমি তার মুখোমুখি গিয়ে বসলাম। হেসে বললাম, আসো, আমরা কথা বলি।

কিছুটা সহজ যেনো হলো সে। বললো, আমার নাম...

আমি তো তোমার নাম জানতে চাই নি!

সবাই তো শুধু নামই জিজ্ঞেস করে।

সবাই?

না, কেউ কেউ। অনেকে কিছু জিজ্ঞেসও করে না...

তার শুদ্ধ উচ্চারণ আমি অবাক হলাম না।

আমি বললাম, তোমার নদীর নাম কী?

মেয়েটা প্রথমে অবাক হলো। বললো, এটা আবার কেমন প্রশ্ন?

বললাম, কেনো, তোমাদের গ্রামে কোনো নদী নেই?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে তার নদীর নাম বললো, তিতাস।

নদীর নামটি যেনো প্রাণের অতলান্ত কোনো গহ্বর থেকে সে বলতে চাইলো। তারপর বললো, আপনি বুদ্ধিমান। তবে সরাসরি জানতে চাইলেও বলতাম আমার গ্রামের বাড়ি কোথায়। আমি এখনো মিথ্যা বলতে শিখি নি!

আমি মোটেও অপ্রস্তুত হলাম না; কেনো না তার সাথে আসলেই আমি চালাকি করি নি। আমি সত্যি সত্যি তার নদীটির নামই জানতে চেয়েছি– যে-নদীটির চরে, উপকূলে ফেলে এসেছে সে সোনালি শৈশব, জলাঞ্জলি দিয়েছে কৈশোর।

আমি এইবার বললাম, তিতাস একটি নদীর নাম।

সে এখন খুব সহজ। সাথে সাথে বললো, অদ্বৈত মল্ল বর্মণ।

পড়েছো তুমি?

হ্যাঁ তো! আমাদের পাঠ্য ছিলো।

তা না হলে পড়তে না?

কেনো পড়তাম না? আমি তো অনেক বই পড়ি। কথাটা বলেই তার মুখে মলিন একটা ছায়া নামলো। আর বললো, না, পড়ি না, একদিন পড়তাম।

কার কার লেখা পড়েছো?

শরৎ আমার প্রিয়। তাছাড়া আরো অনেকের। বাবার তো ঘরভর্তি বই ছিলো।

রবিনাথ পড়েছো?

সাধারণ মেয়ে...

আর?

সমরেশের সাতকাহন পড়ার ইচ্ছা ছিলো অনেকদিন।

এখন নেই?

সে কোনো উত্তর করলো না। বললাম, কবিতা?
রূপসী বাংলা আমার অনেক প্রিয়। বাবার ঘরে জীবনানন্দ সমগ্র ছিলো।
আচ্ছা, তুমি সবকিছু ছিলো বলছো কেনো, এখন নেই?
এবারও সে উত্তর করলো না কেনো; তার চোখে পুনর্বার ছায়া পড়লো। চুপিচাপ বসে থাকলো খানিকক্ষণ নতমুখে। তারপর চোখ তুলে সরাসরি আমার চোখের ভিতর তাকালো; আমি ভিতরে কেঁপে উঠলাম। বললো, আপনি কী চান বলুন তো?
আমি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলাম। তার কথার জবাব কী দেবো খুঁজে পেলাম না। কিছু না ভেবেই বললাম, আমরা খুব বন্ধু আজকে থেকে। হ্যাঁ?
তার বিস্মিত-চোখের ভিতর তাকিয়ে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ডানহাতটা তার মাথায় রাখলাম মুহূর্তের জন্যে। তারপর পকেট থেকে একশোটাকার দুইটা নোট বের করে তার সামনে বিছানায় রেখে ঘর হতে বেরিয়ে এলাম।

গত দেড়মাসে কম করে হলেও তার কাছে আমি আটবার গিয়েছি। না, এখনো সেই অভিজ্ঞতা আমার হয় নি। কেনো না আমার ভিতর যে-মানুষটা বাস করে– সে আমাকে বলে, এতো সহজ নয়, সহজকথা...। আমার কাছে যাকিছু ভালোবাসাহীন– সমস্তই পাশব। এখনো তার জন্যে আমার মায়া হয়। আর তা কেবল তার কাছে গেলেই। ভালোবাসলে তার জন্যে আমি কষ্ট পেতাম– তার কথা মনে হলেই।

তার কাছে যাই, দুয়েকটা ড্রইং করি, কবিতার কথা বলি, ছবির কথা বলি... নদীর গল্প করি। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা বই আমি তাকে কিনে দিয়েছি। সে তার অনেকগুলিই রাতজেগে পড়ে শেষ করে ফেলেছে। শেষবার বইটি তাকে দিয়েছি সেটা সাতকাহন নয়, হুমায়ূন আজাদের নারী। সাতকাহন দিই নি কারণ দীপাবলি শেষপর্যন্ত তার জীবনের মানুষ হওয়ার সমস্ত সংগ্রাম জলাঞ্জলি দেয় তার ঠাকুর মা'র বুকে ঝাপিয়ে পড়ে– নারী হয়ে।

তাকে মনে পড়ে, তাকে মনে পড়ে, তাকে মনে পড়ে।
আমি তাকে তার নাম ধরে ডাকি নি একদিনও। ডেকেছি নিজের দেয়া নামে। একটা গোপন নামে তাকে আমি ডাকি।

তাকে মনে পড়ছে। ভাবছি, আজ বিকেলে রোদটা দিঘির বুকের মতো কোমল হলে তার কাছে আমি যাবো...

দরজাটা ভেজানো ছিলো। আমি আলতো হাতে একটি কপাট খুলে ঘরে ঢুকলাম। ঘরভর্তি অন্ধকার। বাতিটা জ্বালালাম। প্রথমে চোখ গেলো জানলার দিকে। ওটা বড় বড় পেরেক দিয়ে আটকানো। আর তাকে দেখে বুকের ভিতর প্রচণ্ড ধাক্কা খেলাম। আমার মাথায় এইসব ছিলো না। আমার ভয়ানক যন্ত্রণা হলো। তার বিছানার ধবধবে চাদরটা মাঝখানে যেনো রক্তে ভেসে গেছে। খাটের একপাশে বেড়ার সাথে হেলান দিয়ে সে বসে আছে। দুইপা ছড়ানো।

দুইচোখ বোজা। ক্ষণে ক্ষণে তার বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। তার গালে, গলায় ক্ষত। তার পরনের শাড়ি এলোমেলো, রক্তাক্ত; যেনো এখানে সেখানে ফুটে আছে রক্তজবা।

আমি তার কাছটায় গিয়ে বসলাম। আমার এমন কষ্ট হবে ভাবি নি একদিনও। অনেক কষ্টে অস্ফুট অথচ গাঢ় স্বরে তাকে ডাকলাম, গোপন!

সে চোখ খুললো। প্রথমে আমাকে চিনতে পারলো না বোধহয়। আমি তার মাথায় হাতটা রাখলাম আস্তে করে। সে দুহাতে আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলো। খুব শক্ত করে। তারপর চোখ বুজলো। যেনো উন্মাতাল ঝড়ের ভিতর বড় একটা গাছের শক্ত-মোটা একটা ডাল সে ধরে আছে পরম নির্ভরতায়; ডালটা যে তার মাথায় যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে- সে ভাবনাও নেই।

আমার নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো।

হাওয়াচুর

অনিবার্য আগুনে পুড়ে যেতে চেয়েছিলাম একদিন। পুড়েছি প্রতিদিন, ভস্ম হই নি। একদিন জরাসন্ধ হয়ে জন্মেছিলাম, জুড়ে দিলো যেজন– তার নাম জরা নয়, অভিমান। আমি তার মুঠোর ভিতর দৃশ্যের পাথর, তার মুঠোভর্তি আমার চোখ।

মেঘদুত ভালো লাগে। অনেকবার পড়েছি। হয়েছি মনে মনে বিরহী যক্ষ। বুদ্ধদেবের অনুবাদ মূল সংস্কৃতির চেয়ে শক্ত। মাত্রা ঠিক রাখতেই বোধকরি তিনি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। একদিন ভাবলাম, আমি নিজেই মেঘদুত অনুবাদ করবো।

তার সাথে আমার পরিচয় ছিলো না। অথচ আমরা পরস্পরকে চিনতাম। একদিন বলেই ফেললাম, আপনি আমাকে সংস্কৃত ভাষাটা শেখাবেন।
তার বিষয় সংস্কৃত। সে কারণ জানতে চাইলো।
মেঘদুত অনুবাদ করবো।
ঠিক আছে। ছয়মাস পর। আগে আমাকে ভালোভাবে শিখতে হবে।

সে চলে গেলো।

সতেরোদিন পর তাকে দেখলাম। জারুলবনে হেঁটে বেড়াচ্ছিলো। ডাক দিলাম, অ্যাই... আপনার সাথে কথা ছিলো...
না ফিরেই জবাব দিলো, ছয়মাস পর।

একদিন মিছিল নামলো। দাবী আদায়ের মিছিল। আমি তখন মিছিলের। প্রখর রৌদ্র আর স্লোগানের ভিতর তাকে খেয়াল করি নি। মিছিলে তারও পা চলছে, হাত উঠছে, হাত নামছে। আর আমাদের কণ্ঠের গান তখন নিবিড় স্লোগান।

যথারীতি ঝাপিয়ে পড়লো একপাল কুকুর, সনখ। রুখতে যখন গেছি– আর মনে নেই...

আমি আর্তনাদ করছিলাম। আমার চেতনা আসছিলো, আবার চলে যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো আমার দুটো হাতই ভেঙে গেছে। হাড় ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। আমি বোধহয় হাতের জন্যে কাঁদছিলাম, না হাতের জন্যে নয়, বোধহয় কিভাবে কবিতা লিখবো, ছবি আঁকবো এইসব বকছিলাম।

সে এসে আমার বুকে হাত রাখলো, হাত রাখলো চুলে। বললো, তুমি বলবে, তোমার কবিতা আমি লিখে দেবো ইত্যাদি।

তার চোখে তখন আষাঢ়ের সকল বৃষ্টিপাত।

একদিন মেঘের একটি হাত নেমেছিলো আমার বুকের খরায়, আমার হিজিবিজি চুলের বনে... মেঘের নাম অভিমান। অভিমান! তুমি কি আমার পুজো নিবে?

আমার জন্যে কেউ কোনোদিন কাঁদে নি। একজন একদিন কেঁদেছিলো– আমাকে আমৃত্যু কাঁদাবে বলে।

আমার স্বপ্ন, আবেগ আর শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই। আর তুমি অভিমান।
অভিমান, তোমাকে এখনো জানি না।
সে অবাক হলো, বললো, শূন্যতা!
হ্যাঁ, শূন্যতা যতোদিন মানুষকে ঘিরে থাকে মানুষ ততোদিনই সুন্দর থাকে।
মানে!
বুঝলে না? বুঝবে না জানতাম। মানে তুমি ধরা দিলে তো তোমাকে আর খুঁজে বেড়াবো না।
তুমি হাসলে এবার।

বললাম, শূন্যতা সুন্দর।

কী তাকাও?
তোমার চোখের ভিতর।
না।
কেনো?
আমার চোখে কী আছে?
স্বপ্নের বিষ।

অভিমান তোমাকে আমি বুঝি না, কিংবা তুমিও আমাকে...। বৃষ্টি এলে কি তুমিও পুড়ে যাও, আমি যেমন? আমি সোনালু ফুলকে রাধাচূড়া বলে ডাকি। আমি ডাহুক চিনি না, আমি পানকৌড়ি চিনি না...

তোমার কণ্ঠে ছিলো রুদ্রের গান, ...দিও তোমার মালাখানি...
তোমার কণ্ঠের গান দিগন্ত ছুঁয়ে আমার কাছেই ফিরছিলো। তুমি বললে, ছি! তুমি নিমগাছও চেনো না?

তুমিই বলো দোষ কি আমার একার? তুমি যে কোনোদিন চিনিয়ে দাও নি।

তিনদিন দেখা না হওয়ার সুন্দরতম কষ্টের কথা বুঝে না অভিমান। তার বিরহের ক্ষণ ছিলো বৃষ্টির কালে। তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে কেবল রাতের শুরু। সে জানলার গরাদে হাত রেখে দেখছিলো বর্ষার পূরবী। আর আমি নিরন্তর পুড়ে যাচ্ছিলাম বৃষ্টির আগুনে– একা একা, একা একা।

আমি, সে, সে আর সে গাঁজা টানছিলাম আয়েস করে। আমাকে এইসবে কাজ করে না। মদেও না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমি নিজেই মদ, নিজেই...
ওখানে পাঠ করলাম, আমার সদ্য লেখা পদ্যটা,
একজন হেঁটে চলে গেলে
অরণ্যের বুকে পড়ে থাকে শুধু প্রান্তর; আর কেউ থাকে না–
থাকে শুধু একজন: কোমল পাথর।

সে বললো, অরণ্যের বুকে প্রান্তর থাকে না।
প্রান্তর যে শূন্যতার রূপক– তাকে তা আর বুঝাতে মন চাইলো না।
বললাম, ওকে বস্। প্রান্তর বাদ। হোক তবে পাতার মর্মর।

পথে অভিমানের সাথে দেখা। সে দাঁড়ালো– আমার হাত থেকে পদ্যটা নিলো। নির্বিকার পড়ে গেলো। তারপর মুঠোর ভিতর আমার চোখদুটি নিয়ে ফুরিয়ে গেলো। ফুরিয়ে গেলো, ফুরিয়ে গেলো।

না, সে একবারও পেছন ফিরে তাকালো না।

ডুবোজ্বর

সে পেছন পেছন আসে। তার হাতে একটা করুণ সুর্মাদানি। আমি ভুল করে দাঁড়িয়ে পড়ি। আমার ভুলের প্রান্তে তার হাসি উঁকি দেয় বোকা বোকা।
দাদা, একটু পরিয়ে দিই।
আচ্ছা দাও।
সে আমার চোখভর্তি করে দেয় সুর্মায়। আমার চোখ জ্বলতে থাকে। আমি চোখ বন্ধ করি, চোখের কোণা গড়িয়ে জলে ভিজে যায় গাল। চোখ খোলার পর দেখি সে নেই, তার হাসি আর সুর্মাদানি ফেলে গেছে তার একফালি ছায়ার উপর। আমি অবাক হবো ভেবে চুপিচাপ তাকিয়ে থাকি পোড়োবাড়ির জানলায়। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই; গরাদের গায়ে গায়ে ঝুলছে একানব্বই বছরের মরিচা। আমি তার হাসিটাকে গরাদের সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁটি। কিন্তু ছায়াটা আমার পিছু ছাড়ে না। আমি দৌড়াই গলিপথ ধরে, রাত বাড়তে থাকে। লাইটপোস্টগুলির গা বেয়ে উঠি, ছায়াটাও উঠে, আলোকে হত্যা করি একে একে, ছায়া মরে যায়; আর গরাদ ছিঁড়ে হাসিটা আমার কাছে ফিরে আসে, মুখ বন্ধ রাখি, ঠোঁট চেপে ধরি, হাসিটা ঠোঁটে বসতে না পেরে চোখের গর্তে ঢুকে বসে; টের পাই সুর্মার বেদনা। জলের সন্ধান করি এপাশ-ওপাশ। অগত্যা নর্দমায় নেমে ধুয়ে ফেলি চোখ, দৃষ্টি এবং দৃশ্য।

এইখানে এইসব ঘ্রাণ অসীম এসে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলো। আমি মুক্তি পেলাম। মুক্তি কি আসলে পেলাম? অসীমের রঙ নাই। সে একজন ক্লিউপেট্রার মুখে হেলান দিয়ে বসে থাকে, তার বসার ভঙ্গি, তার বিষণ্ন চোখ আমি ভুলতে পারি না। ভাবি তাকে নিয়ে একটা গল্প লিখবো। সে হারিয়ে যায়, আর উন্মুক্ত হয় রোমান সম্রাজ্ঞীর মুখ।
এই দাদা! এতো কী ভাবছিস?
আমি তার মুখের দিকে তাকাই। তার গায়ে অন্ধকার আর আঙুলে ঝুলে আছে চৈত্র।
শবযাত্রার সাথে গান এবং ফুলের একটা সম্পর্ক আছে। কী সম্পর্ক বলতো?
এইসব কী কথা? তুই কি প্রায় দুঃস্বপ্ন দেখিস?
কেনো?
কেমন করে ঘুম ভেঙে যায়! বসে থাকিস, পানি খাস...
তুই কেমন করে জানিস?
কী জানি!
আমি জানি না।
ও।
মাসিমা কইরে?
কী হয়েছে তোর, দাদা?
কেনো?
এইসব কী বলছিস?
কী বলছি?

মায়ের মুখাগ্নি কে করেছিলো? তুই কেনো সব ভুলে যাস?
তার চোখে জল। সে দুহাতে মুখ ঢাকে। আমি তার মাথায় হাত রাখতে গিয়েও রাখি না। আমার সব মনে পড়ে যায়।

ইচ্ছে ছিলো খবরটা তাকে আমিই প্রথম দেবো। কিন্তু দেখলাম আরেকজনকে, একটা সারসপাখি যার বাহন। তার সাথে কি আমি পারবো? প্রশ্নই আসে না। পকেটে টাকাকড়ি নেই, আমাকে যেতে হবে পায়ে হেঁটে, পায়ে হেঁটে। আমি হাঁটতে হাঁটতেই সে খবরটা পেয়ে যাবে। তাতে কী? তাকে তো দেখতে পাবো। আমি হাঁটছি। আমি হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হবো। ওর সামনে গেলে ওর চোখের নিটোল স্পর্শে আমার ক্লান্তি চলে যাবে, আমার সকল ক্লান্তি মরে যাবে। আমি জানি, আমি জানি। মনে আছে, একদিন পাহাড় হতে ফেরার পথে নৌকোয় যেতে যেতে তার সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিলো।
তোমার কি ছোটো ছোটো ক্লিপ আছে?
কেনো? আছে তো!
থাকলে তোমার চোখের কূল ঘেঁষে যে অলক নেমে এসেছে, তা আটকে রেখো, বুঝলে?
খুব কি বিশ্রী লাগে?
না, পাগল হওয়ার মতন সুন্দর।
সেদিন সে উচ্ছল হেসেছিলো আমার কথায়।
তাকে ভাবতে ভাবতেই হাঁটছি আমি। ওর ঘরের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। এতোক্ষণে সে জেনে গেছে। নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো। আমার পরনে ময়লা শাদা শার্ট। চুল উস্কুখুস্কু। গালে এক এগারোদিন না-কামানো দাড়ি। ক্লান্ত দেহ। আমি হাঁটছি। আমি হাঁটছি।

তার ঘরের দরোজায় গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তাকে দেখতে পেলাম, পেছনটা দেখা যাচ্ছে তার। একটা বাঁশের মোড়ায় বসে আছে সে; বোধ করি সিলিং এর দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখে নি। ওর পাশে একটা সারস বসেছিলো; তার চোখেই পড়লাম প্রথম।
সে এলো; এক আকাশ আলোর বন্যা নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো আমার সুমুখে, এসে দাঁড়ালো দরোজা আলো করে। আরে, আপনি! আসেন। ও দুহাত বুকের কাছে জোড় করে বললো, নমস্কার।
আমি প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে হাত জোড় করতেই আরো একবার মনে হলো, ও কি দেবী? মনে হলো বেদীমূলে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ইচ্ছে হলো প্রণাম করি, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ও দরোজা ছেড়ে একপাশে দাঁড়ালো। আসেন।
ওর সাথে কী কী কথা হলো তেমন মনে নেই। ঘরে বসলাম। আগেরবারও একই জায়গায় বসেছিলাম। সারসপাখি ছিলো বলেই তার মুখে শুনেছো প্রথম... এ জাতীয় কথা-টথা বললাম। আমার ক্লান্তি গেলো না। আমি কি তবে ওর কাছে অযাচিত। কেমন আনইজি লাগছে। কথারা সব কোথায় গেলো? কী কথা?
ও আমাকে বসতে বলে ভিতরে গেলো। আমি ভাবছি, আমি ভাবছি। আমার ক্লান্তি গেলো না। এতো আনইজি লাগছে কেনো আমার? আমি কি আনফিট? আমি ভাবছি। আমি ভাবছি।

চায়ের কাপে একটা মরামাছি মরে ভাসছে ধোঁয়ার সাথে। কাপটা ছুঁতে ইচ্ছে করলো না, চাইলেই ভেঙে ফেলতে পারি; কিন্তু ভাঙলাম না। ঝুপড়ি ছেড়ে বের হয়ে গেলাম, কী ভেবে আবার ঢুকলাম, কাপটা এখনো টেবিলেই আছে। বসলাম, দুআঙুলে মাছিটা তুলে ফেলে চা-টা খেলাম, সাথে দুটি পিঁয়াজু।

তার কথা ভাবছি। সে উড়ে যাওয়ার পর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। একটি সারস এসে বসলো আমার পায়ের কাছে; কথা বললো। কী কথা মনে নেই। তারপর সারসটির দুটি পাখনা খসে পড়লো মাটিতে, ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে আমার মুখ ভিজিয়ে দিলো, চোখের ভিতর অন্ধকার দেখলাম।

সারসটি আমাকে কী বলেছিলো?

শার্টের হ্যাঙ্গারে দিকে তাকিয়ে থাকি। একটি শার্ট ঝুলছে, এবং দুলছে বাতাসে। শার্টের গায়ে চিতি পড়েছে হালকা। আমি দুহাতে বাতাসের গায়ে রেখা আঁকছি।
দাদা!
সে এসে দাঁড়িয়েছে আমার চেয়ারের পেছনে। তার ভেজাচুলে ঝরছে শরৎ।
কী?
আমি একদিন চলে যাবো।
কোথায়?
তুই কী বই পড়ছিস?
কোথায় যাবি?
বাদ দে।
সে আমার সামনে এসে মেঝেতে বসে। আমি তার মুখের দিকে তাকাই। সে চুপচাপ বসে থাকে। তার চোখের ভিতর ছায়ার মৃত্যু হয় না।
দাদা!
বল্।
একটা জিনিশ দেখবি।
কী?
সে পেছন ফিরে বসে। এবং তার কামিজের চেনটা টেনে নামিয়ে দেয়। তার খোলা পিঠ দেখে আমি চমকে উঠি। সে তা বুঝতে পারে। বলে, কী অবাক হলি?
কী হয়েছে, তোর পিঠের হাড় ওভাবে বের হচ্ছে! ডাক্তারের কাছে যা এখনি।
এখন তো অনেক রাত।
তাহলে কাল অবশ্যই যাবি।
নারে, দাদা।
কেনো?
ওটা আমার ডানা বের হচ্ছে। জানিস! একটুও ব্যথা নেই।

আমি অপার হয়ে ওপার দেখি। আমি অপর সে এবং তার কাছে। খানিকক্ষণপর সে আসে, আমার কাছে অনন্তকাল; সে চা নিয়ে এলো। ওকে মাদুলিটা দিলাম, তোমার জন্যে।

ও হাত বাড়িয়ে নিলো, থ্যাঙ্ক য়্যু।
ওয়েলকাম।
আর কী বলবো বুঝতে পারছি না। বললাম, মাকে ডাকো।
আমার মাকে?
হ্যাঁ।
মা তো ঘরে নেই, বোধহয় পাশের বাড়ি গিয়েছে।
সেই পাহাড়ে জানো, মেঘ ছোঁয়া যায়! তুমি যাবে?
ও একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললো, দেখি।

সে একটুক্ষণ ভিতরঘরে গেলো আর এলো। তার হাতে একটা পদ্মফুল। আমাকে দিলো; আবার ফিরিয়ে নিলো।
এটা পদ্ম?
না, ইহা মৃণাল। সে নিঃশব্দে হাসলো।

দীর্ঘক্ষণ চুপিচাপ পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকলাম। আমার ক্লান্তি গেলো না। যাই।
বসেন না। আপনি আসবেন বলেছিলেন। কিন্তু সত্যিসত্যি যে আসবেন তা ভাবতে পারি নি।
এইতো এলাম!
কথাটা আমি গভীরভাবে বলতে চাইলাম। বোধহয় পারলাম না। আমার ক্লান্তি হয়তো ওর চোখে পড়েছিলো। ও জানতে চাইলো আমি সাইকেলে এসেছি কিনা।
না, পায়ে হেঁটে এসেছি।
খুব কষ্ট হয়েছে, না?
জবাবটা গুছিয়ে দিতে গিয়েও পারলাম না, কষ্ট কিসের? পায়ে হেঁটে, পায়ে হেঁটে এসেছি। মনে মনে বললাম, এসেছি তোমাকে ভেবে ভেবে, তোমার জন্যে, তোমার জন্যে... সুন্দরের কাছে দীর্ঘপথ হেঁটে আসতে হয়...

আবারো চুপচাপ। বাইরে শেষবিকেলের রোদেরা মেলেছে পাখা সুদূর দিগন্তের দিকে। আমিই নীরবতা ভাঙলাম, যাই।
খুব কি অসুবিধে হবে, আরেকটু থাকলে?
ওর কথায় জোর নেই। আবারো নিজেকে অসহায় মনে হলো খুব। আমার বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে। মন চাইছে ওর মুখোমুখি বসে থাকি অনন্ত সময়। কিন্তু সব ইচ্ছে তো পূরণ হবার জন্যে নয়। উঠে দাঁড়ালাম, যাই।
ঠিক আছে। আবার আসবেন।
আমি বললাম, না, আর আসবো না।
ও যে এখানে থাকবে না তা আবারো বললো। ও বললো, যতোবার অরণ্যে আসবেন– প্রতিবার আমাদের বাড়ি আসবেন।
কথাগুলি বুঝলাম ও গভীরভাবে বললো; প্রাণের গভীর থেকে যেনো। এই মুহূর্ত হতে আমার ভালোলাগা শুরু হলো। কোথায় ক্লান্তি? আকাশ হতে মেঘেরা সরে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে, যেনো আমার মনে নেই কিছু। প্রথম দেখায় যেনো এলো শুচিময় ভোর। এখন তার দরোজায়

দাঁড়িয়ে আমি ভাবছি, ক্লান্তিগুলি কোথায় হারালো? আমার আকাশ হলো নীল।
আবার আসবেন।
যাই। তুমি ভালো থেকো।
গভীর থেকে নিরন্তর অনুচ্চ স্বরে বললাম শেষের কথাটা। শেষ বিকেলের কুমারী রৌদ্র গায়ে জড়িয়ে আমি রাস্তায় নামলাম। মনে মনে বললাম, তোমার কাছে ফিরবো না আর। প্রশ্ন এলো, মানুষ ফেরে কার কাছে? কী জানি, যাবো হয়তো আবারো। নিজেকে জানি না।

সে কখন এসে ঘরে ঢুকেছে টের পাই নি। সে মুঠোতে ধারণ করলো উত্থিত আমাকে। দাদা, এটা তো সারস পাখি, গলা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।
আমি কেঁপে কেঁপে গেলাম।
সে নিজেই উন্মোচিত হলো, বাহিরে অনকে দুরে, অনেক উপরে একটা তারা নিভে গেলে অন্যটি জ্বলে উঠলো।
আমি উন্মোচিত তাকে দেখলাম; আর কেঁপে কেঁপে গেলাম। তার মুঠোতে আমার সমস্ত যৌবন। তার পিঠে হিরণ্ময় একজোড়া ডানার উত্থান। আর আমি তাকে দুঠোঁটে চষে, ঝিরিঝির দংশনে চিরে, দুহাতে ভেঙে ফেললাম। আর দেখলাম তার ডানার বিস্তার।

বাতাস ঝড় হলে প্রথমে ভাঙলো আমার দরজা। দরজার পাশে উপবিষ্ট আমার নির্ঘুম রাতের কলস। ছলকে উঠলো জলস্বর। আমি তখনো বসে। আমার চাকাঅলা চেয়ারটা কাঁপছে ঝড়ে। তারপরে আমি। ঝড় একটানে খুলে নিলো পর্দা আমার দেহের। আমার হাঁটু থেকে কাটা পায়ে দেখি গজাচ্ছে অস্তিমজ্জা। ঝড় বললো, আয়।

সবশেষে শিশুটি এলো। মাথাভর্তি চুলের বন্যা তার। মুখের রেখা তার এবং তার মতো। হামাগুড়ি দিয়ে এলো আমার কাছে। চুপিচাপ হাসলো নিঝুম। তারপর একটানে সারসের গা থেকে খুলে নিলো গলা।
ঝড় বললো, রক্ত।
না, ইহা মৃণাল। শিশুটির কণ্ঠস্বরে আমি চমকে উঠে ভুলে গেলাম ক্ষরণ। অবিকল তার মতো কণ্ঠস্বর।
ঝড় বললো, যাই।

বটফুল

কোথাকার কোন সরোবরে উদ্ভিন্ন সংবাহন! স্বপ্নে দেখা বটফুল। উজ্জীবিত দিনের পদভারে নত সন্ধ্যার দেহ। মোমের ভদ্র গম্ভীর সলতে; তার জ্বলতে থাকা কোমল অহঙ্কার– প্রভাবিত করে কারো অনন্তর পিছিয়ে পড়া। সে হয়তো উত্তীর্ণ হতে পারে। অথবা পতন নিশ্চিত জেনেই ভাবনাতাড়িত ব্যঞ্জনাকে ধরে মোমের সলতে হয়ে যায় শূন্যতার সংবাহে। একদা সে বটফুল স্বপ্নে দেখেছিলো।

ওই নদীপথে হাঁটতে হাঁটতে ঝিমঝিম সন্ধ্যা নেমে আসে। নদীটা একটা পাহাড়ের পায়ে নূপুরের মতো রিনরিন শব্দ তুলে ঘুরেটুরে কোথায় গেছে সে জানে না।

সে হাঁটছিলো। নদীটা সরু আর পাথুরে। কুয়াশা নেমে আসছে দশদিগন্তে। সে নদী ছেড়ে নাড়াবিধুর জমিতে পা রাখলো। তারপর বাড়িঘর, বাঁশবন, শালবন, জলপাইগাছগুলি পেরিয়ে সে যে-বাড়িতে ঢুকলো– ওইখানে একটা জানলাবিহীন ঘরে সে থাকে।

তার মনে হলো জলপাইয়ের পাতা রূপবতী; এবং ঝরার আগে পাতাগুলি নয়নার মতো।

সে দুহাত দুপাশে মেলে দৌড়াচ্ছিলো লাফিয়ে লাফিয়ে– একটা বনপথে। তার মনে হচ্ছিলো দুপাশের গাছগুলি ডানা মেলে আকাশের পাখি হচ্ছে এক একটা; আর গাছের জায়গায় একটা করে চারাগাছ ক্রমশ বড় হচ্ছে, মাটিতে অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে, ফুলগুলি সব প্রজাপতি হচ্ছে আর কুঁড়িগুলি ফুল। তার নিজেকে মনে হচ্ছিলো চিলপাখি। তারপর সে উঠে এসেছে একটা চারতলা বাড়ির ছাতে। শুয়ে আছে, নিবিড় শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। এই ছাত মাঠের বিস্তার নিয়ে আছে। এটা রাজীবদের বাড়ি। এতো বড় বাড়ি ওরা কবে করলো সে ভাবতে পারছে না।

সে শুয়ে আছে। সে চোখের দুইটি পাখি উড়িয়ে দিয়েছে আকাশে। ওরা বটপাতাদের ফাঁক গলে আকাশে উড়ছে। আকাশের মেঘেরো বুঝি সব রামগিরি থেকে অলকায় যাচ্ছে। তাদের নীলধূলি পথে অবাধ চলাচল।

সে কতোক্ষণ শুয়ে আছে মনে নেই। হাওয়া খেলছিলো এখানে ওখানে মখমল ছায়া। হাওয়াটা এখন বাতাস হয়ে গেছে। বাতাস ক্রমশ ঝড় হচ্ছে। গুড়িগুড়ি বৃষ্টি যেমন হবে ঝুম-ঝুম, ঝুম-ঝুম।

সে শুয়ে আছে তেমনি। সকাল কিংবা দুপুর অথবা দিনেরই একটা উজ্জ্বল সময়। ছাতটার অনেক উপরে বটগাছটা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে। এতো উঁচু, এতো বিস্তৃত বটগাছ পৃথিবীতে কিভাবে হয়! গাছটিতে যতো পাতা ততো ফুল। বটফুল সে কখনো

কোনোদিনও দেখে নি। বটফল দেখেছে– গাঢ় কমলা। নাকি লাল? কিন্তু এইগাছে সব ফুল–ফলের রঙ।

প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে গেছে। সে আগের মতোই। ঝড়ের ঝাপটায় তার চুলে, বুকে, মুখে, চোখে, নাকে, হাতের আঙুলে, সমস্ত দেহে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে বটের ফুল। আশ্চর্য সুন্দর। ঝড় থামছে ধীরে ধীরে আর বৃষ্টি বাড়ছে। আয় বৃষ্টি ঝেঁপে...

ঝুম ঝুম ঝুমঝুম বৃষ্টি হচ্ছে এখন। এখনো বটফুলগুলি ঝড়ছে বৃষ্টির ফোঁটার সাথে তার সারাটা দেহে। এমন আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতি সে কাকে দেখাবে, কার কাছে করবে এমন বিশুদ্ধ প্রকাশ? অকস্মাৎ নয়নার কথা মনে হলো তার। সে শোয়া থেকে উঠলো এবং দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নামলো।

সে নয়নার একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিলো। আর তাকে নিয়ে এলো চারতলার ছাদে। কিন্তু খেয়াল করলো নয়নাকে সে কিছু বলার আগেই তার চোখ আটকে গেছে অনেকদূরের পাহাড়টার ওপারে। ততোক্ষণে ঝড় বৃষ্টি সমস্ত ঝরে গেছে বটফুলের মতো, পায়ের কাছে, যেনো বা আধফোটা চাঁপাফুল।

নয়না দেখছে একটা কালো ঘুড়ি উড়ছে পাহাড়ের ওপারে। নয়না নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিলো তার মুঠোর ভিতর থেকে। এবং ঘুড়িটার উদ্দেশ্যে হাত তুললো। আর ওটার দিকে হেঁটে চলে গেলো। সে দেখলো ছাদে কোনো বাউন্ডারি নেই।

নয়না নেই। দুরের ঘুড়িটাও নেই। কেবল কালোচাদিয়ালের পাহাড়ের পায়ে পেঁচিয়ে আছে নূপুরের মতো একটা পাথুরে নদী, রূপা রঙ, ভীষণ স্তব্ধ। আর সে জমে প্যাথর হয়ে গেলো এইসব দেখতে দেখতে। শুনতে পেলো পেছন থেকে তার নাম ধরে কেউ ডাকছে অবিরত।

তার শিয়রে মা বসে। মা তার জানলাবিহীন ঘরের মুহূর্তের জানলা।
কী স্বপ্ন দেখছিলি, বাবা?
জানি না।
সে দুহাতে মায়ের কোমর পেঁচিয়ে ধরে আবার চোখ বুজলো।

সে বনটা পার হচ্ছে আস্তে আস্তে। গাছগুলি বিবর্ণ। পাতারা ঝরে যাচ্ছে ক্রমে। সে তার আশ্চর্য সুন্দর চোখে স্বপ্নটাকে জুড়ে দিলো এইসব গাছে গাছে। বন পার হয়ে নদীটা পার হলো অনেকক্ষণ নদীপথে হেঁটে। তারপর স্কুলটা, স্কুলের মাঠ পার হলে একচিলতে ফিতের মতো মাটির রাস্তা। এই রাস্তা ধরে প্রতিদিন দুপুরের পর নয়না বাড়ি ফেরে। নয়না তাকে এখনো চেনে না। তবু সে আজো নিয়ে এসেছে কোচড়ভরা বকুল। আজো সে পথের একটা জায়গায় ফুলের একটা বাঁধ তৈরি করলো, সরু। এইবাঁধ পার হয়ে নয়না বাড়ি ফিরবে।

সে মাঠে বসে আছে। দেখলো নয়না প্রতিদিনের মতোই ফুলগুলিকে মাড়িয়ে গেলো। তার দিকে একবারও তাকালো না।
সে তাকিয়ে আছে চলে যাওয়া নয়নার দিকে। দুরত্ব যতো বাড়ছে– নয়নার আকার ক্রমশ ছোটো হচ্ছিলো।
জলপাই গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো নয়না। জলপাই গাছের ঝরার আগের পাতাগুলি লাল হয়ে বুঝি নয়নার দিকেই তাকিয়ে আছে।
আর সে একজনও মাঠে বসে তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে।
খানিকক্ষণ পর পরীর মতো একটা ছেলে এসে দাঁড়ালো নয়নার পাশে।

ছেলেটার হাতে বিশাল কালোঘুড়ি।

কুয়াশার হাত ধরে ঝিমঝিম সন্ধ্যা নামছে। সে বনটা পার হতে হতে সহসা দেখলো পাহাড়টাতে আগুন জ্বলছে। আগুনের লেলিহান জিব ছুঁয়ে দিচ্ছে উত্তরের মেঘগুলি।

এখন জুমচাষের সময়।

অন্ধনথ

শেষ পর্যন্ত রেণু উঠতে পেরেছে। এইটা বগিটা মাল টানে। অন্ধকার এবং অনেকটা ফাঁকা। রেললাইন আর চাকার ঘর্ষণে যে শব্দযজ্ঞ উঠানামা করছে এইসব আলো-আঁধারিতে- তা অদ্ভুত এক নৈঃশব্দ্যের জন্ম দিচ্ছে তার চোখের ভিতর।

মধু ঘরে বউ এনেছে। তার কোনো উপায় ছিলো না।

বোনটাকে বিয়ে দিয়েছিলো মধু। দুইবছরের মাথায় ভাইয়ের কাছে ফিরতে হলো- পোয়াতি।
স্বামী গঞ্জে দোকান দেবে, হাজার পঞ্চাশেক টাকার দরকার।
তো দাও না। আমাগো পোলার ভাগ্যে কইলাম ভালাই চলবো।
বউ, খালি ভাগ্যে যে কিচ্ছু অয় না। টেকার দরকার। তাই কইতাছিলাম। মানে ইয়ে...
কী, কও না আমতা আমতা করতাছো ক্যান তুমি?
কইতাছিলাম, তোমার ভাইয়ের কাছে গিয়া যদি...
কথা শেষ করলো না সে। সেতু হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারছে না।
আমার ভাইয়ের কতা তুমি জানো না? কী কষ্ট কইরা আমারে বিয়া দিছে! একখান ক্ষেত আছিলো তাও বেইচ্চা চিছে। তার কাছে তুমি ক্যামনে যাইতে কও? তোমার দিলে কি...
সেতুকে কথা শেষ করতে দিলো না সে। চিৎকার করে উঠলো, থাম্। বেশি কতা হিক্ছস; কাইল বিয়ানে তোর ভাইয়ের কাছে যাবি, টেকা দিলে ফিরবি, না দিলে কুনোদিন ফিরনের কাম নাই।

মধু তিনরাত ঘুমোতে পারলো না। আকাশ-পাতাল ভাবলো। কোনো সমাধানে আসতে পারছে না সে। পরদিন ভোরে মাঠে যাচ্ছে- রহিমের সাথে দেখা। রহিম তার বন্ধু মানুষ। রহিমই ডাক দিলো। কী গো দোস্তো, দেইখাও না দেইখা চলি যাও। বিষয়ডা কী? তোমারে তো এমুন মুক আন্ধার বেখেয়াইল্লা দেহি না কুনোদিন!
মধু আর নিজের মধ্যে কথাগুলির ভার বইতে পারছিলো না।
লও বই, বইয়া কই।
সব শুনে রহিম বললো, দোস্তো, তুমি একখান বিয়া করো, বিয়া করলে আইজকাইল তো পঞ্চাইশষাইট হাজার না চাইতেই দ্যায়। আমার হাতে একখান মাইয়া আছে। সোন্দর-মোন্দর কম না, তয় একখান চক্ষে নাকি ইকটু কম দেহে। হুনছি পঞ্চাইশ হাজার টেকা দিবো।
মধু হা করে তাকিয়ে থাকে।
কী করবা না করবা হেইডা তোমার বিষয়। তোমার বইনের তো বাঁচন মরণের পরশনো। আর কুনো রাস্তাও তো দেহি না।
মধু দোটানায় পড়ে যায়। রেণুকে সে কথা দিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি তাকে বিয়ে করে ঘরে

তোলে নেবে। ঘরে ফিরে আরো একটা রাত মধু ঘুমোতে পারে না। বোনের চোখের জল সে সহ্য করতে পারবে না। মুয়াজ্জিনের আযানে সে বিছানা ছাড়ে। ঘর হতে বের হয়ে গোয়াল ঘরের দিকেই পা বাড়ায়। একটু সকাল সকাল মাঠে যেতে হবে, রহিমের আসার কথা।

রেণু মধুকে দেখে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে গেলো। কানে সে উত্তাপ টের পেলো। সেদিনের কাশবনের সমস্ত লজ্জা যেনো তাকে আজো জড়িয়ে আছে, আকাশের নীলের মতন। সেইদিনের কথা এই মুহূর্তে বিজলির মতন একঝলক তার মনের জানালয় উকি দিয়ে গেলো। সেদিন মধুর সাথে তার কাকতালীয় ভাবে দেখা হয়ে গেলো নদীর চরে। সে পানি আনতে যাচ্ছিলো, মধু যাচ্ছিল গরু গোসল দিতে। দুজনের মুখে কোনো কথা নেই। রেণু জলের কথা, মধু গরুর কথা ভুলে গেলো। পাশে কাশবন, সহসা নড়ে উঠলো, দুজনেই চমকে তাকালো ওদিকে। একটা শালিক ছটফটাচ্ছে। ওরা এগিয়ে গেলো। রেণু পাখিটা যখন হাতে নিলো তখন টের পেলো সে কাশবনের মধ্যে। তার চারিধার কাশবফুলে ছেয়ে আছে; যেনো আকাশ নেমে এসেছে শরতের মেঘফুল নিয়ে। কেউ বোধহয় ঢিল ছুঁড়ে শালিকটার পা ভেঙে দিয়েছে। রক্ত বের হচ্ছে। রেণু ঘাসপাতা দিয়ে পা টা বেঁধে দিলো। তারপর তাতে ফুঁ দিলো। এবং মাথার উপর দুহাত তুলে সে পাখিটাকে উড়িয়ে দিলো। উড়ে গেলো সেটা। আকাশ হতে রেণু চোখ নামাতেই বুঝলো মধু তার পাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। রেণুও মন্ত্রমুগ্ধের মতন হয়ে গেলো। তার অবাক চোখে আর কম্পমান ওষ্ঠাধরে যেনো জন্মের তৃষ্ণা। মধুও যেনো মরুচারী পথিক অবশেষে এসে থেমেছে মরূদ্যানে। মধু রেণুর কাঁধে হাত রেখে বসালো সমুখে। মুখোমুখি দুজন, নির্জন চারধার আর শুধু কাশবন। রেণু মধুর জন্যে সেই কাশবনে একসময় বিছিয়ে দিলো তার বুকের আঁচল। তারপর রেণু আর ভাবতে পারে না সেদিনের সেইসব কথা...

আনত চোখে তাকিয়ে মধুকে বলে, তোমার মুকখান এমুন আন্ধার ক্যান, কী অইছে তোমার? তিনচাইর মাস তোমার দেখা নাই। হগলদিন তোমার পথ চাইয়া থাকি। তুমি আসো না...

মধু হাঁটু গেড়ে রেণুর পায়ের কাছে বসে পড়ে। পা দুটি জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলে, আমার কুনো উপায় ছিলো না; তুমি আমারে মাফ দেও, দিছো কও...

রেণু কিছুই বুঝতে পারে না। মধু তাকে বিয়ের কথা, সে কী কারণে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে সব বলে চলে একে একে। রেণু যেনো কিছুই শুনতে চায় না। সে মূর্তির মতন বসে আছে। তার ভিতরের আকাশটা আদিগন্ত ভেঙে পড়ছে কাচের মতন। তার দুচোখ দিয়ে বাঁধ ভেঙেছে যেনো পৃথিবীর সকল সমুদ্র। সে যে মা হতে চলেছে তার গর্ভের সন্তানের পিতা যে মধু, সে কথা আর মধুকে বলা হলো না। সে এই আনন্দের কথাটা কিভাবে বলবে মধুকে, কিছুক্ষণ আগেও তা ভেবে পাচ্ছিলো না। মধু বার বার তার হাঁটুতে মাথা ঠুকছে, কও, তুমি আমারে মাফ দিছো...

রেণুর হাতের আঙুল মধুর চুলে বিলি কাটে। সে যেনো ঘোরের মধ্যেই বলে, সব ঠিক অইয়া যাইবো...

মধু তখন বেরিয়ে গেছে। অথচ রেণু তখনও বলতে থাকে, সব ঠিক হইয়া যাইবো, সব ঠিক হইয়া...

রেণু ছুটছে ঝুমবৃষ্টির ভিতর। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ কৃষ্ণমেঘমালার আড়ে শুয়ে ঢালছে অন্ধকার জোছনা। সে ছুটছে। তার পেছনে পড়ে থাকছে বৃদ্ধপিতা, ঘর, ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, সময়, কতোস্মৃতি, মাঠ-প্রান্তর...। নদীতে বান ডেকেছে। সে শুনতে পাচ্ছে স্রোতের বানভাসি শব্দ। তার নিঃশ্বাসের বাতাসে ভাসছে গভীর নদীর উন্মাতাল জলেরঘ্রাণ। ওইতো দেখা যাচ্ছে জল আর জল। আবার পাড় ভাঙলো কোথাও নদীর। পাড়ভাঙার শব্দের সাথে বিজলির আলোতে চমকে গেলো এইসব পরিবেশ। দুরে কোথাও বাজ পড়লো। তার কিছুই খেয়াল নেই। তাকে কেবল টানছে অদুরে নদীর জল। সহসা সে থমকে দাঁড়ালো। অস্ফুট অথচ স্পষ্ট সে শুনতে পেলো যেনো তার গভীর থেকে কেউ ডাকছে, মা-আ-আ-আ-আ...

রেণু আর নড়লো না। দাঁড়িয়েই থাকলো। পিচ্ছিল মাটিতে পায়ের নখ ফুটিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো।

অদুরে ইস্টিশনে তখন বেজে গেলো শেষট্রেনের হুইশেল।

বেহালার বাক্স

এখনো বৃষ্টির দাগ লুকিয়ে রেখেছি বাঁশবনের একটি পাতায়। একটি পাতায় চিরদিন কাঁপে জল আর জলের কুসুম। জলের ইঁদারায় ধূপের গ্রামখানি ঝিমধরা মুহূর্তের দেয়াল– আটকে রাখে অহমিকা আর জন্মান্তর। তিন প্রান্তরের তিনটি শাদাফুলে অনাবৃষ্টির চিহ্ন– এই চিহ্ন কেবলই বাঁশবনের প্রতীক্ষায় রত। আমার আরতি চিরদিন লুকিয়ে থাকে বাঁশের ফুল। তেপান্তর জানবে না বাঁশবন আমার মাথার চুল। শাদাফুল বাঁশের, শাদাফুল জবাকুসুম।

এই ছবিটা কিভাবে আঁকা যায়? কখানি ক্যানভাসে ধরবে দৃশ্যসকল? কী রঙ, কী কালার প্যালেট? শাদা হলুদ সবুজ নীল ধূসর, ধূসর মানে ছাই, ছাই মানে ভস্ম, ভস্ম মানে আষাঢ়ের মেঘ; তারপর গাঢ় সবুজ রঙ। এই বিক্ষিপ্ত দৃশ্যসমগ্র কিভাবে বাঁধা যায়? ঝিমধরা মুহূর্তের দেয়ালের ঘরখানি কেমন হবে? আয়নায় মুখ দেখি; আয়নায় আমার মুখ, চোখ; চোখের মধ্যে আরেক আয়নায় আবারও আমি। এইসব গভীরতর পথের সন্ধান কখন ফুরোবে! অন্ধকার জ্বলে উঠো, জ্বলে উঠো গাঢ়তর বেগুনি-নীল...

আমি অনেকদিন আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম শরীরে জ্বর নিয়ে। আমার শরীরের জ্বর মাথার ভিতর সূক্ষ্ম একটা ঢেউয়ের মতো উঠা-নামা করছিলো। জলের ভিতর চোখ খুলে সবুজাভ আলোয় আমি যেনো একটা স্বপ্নকে উল্টে পাল্টে দেখছিলাম। স্বপ্নের রঙ লাবণ্যময়, নোনতা। আমার শরীর স্যাঁতসেতে, পিচ্ছিল। একটি মাছের চোখে দুইটি জবাফুল ফুটে উঠেছিলো। মাছটি এলো; ডানা ঝাপটালো, চোখ টিপলো; চোখ হতে খসে পড়লো একটি ফুল। ফুলটি ভেসে উঠে যাচ্ছিলো– আমি হাতে নিলাম জবাকুসুম। মাছটি থামলো, তার বুদ বুদ থামলো না...
তোমার রঙ কী?
রূপোলি।
তোমার রঙ কী?
সবুজাভ।
তোমার রঙ কী?
হলুদাভ।
তোমার রঙ কী?
ধূপছায়া।
তোমার রঙ কী?
নীলাভ, সোনালি, কচি লেবুপাতা...
বলতে বলতে মাছটি সবকটি রঙে পরিবর্তিত হলো পরপর।

একটি পাতায় কাঁপে চিরদিন জল। কিসের পাতা? বাঁশের, ঘাসের, চোখের, জবার, লেবুর...? মাছটি ভিন্ন ভিন্ন রঙে আবর্তিত হচ্ছে। শুধালাম, জবাফুল কেনো?
এই জবা শাদা।
জবা শাদা হওয়াই ভালো। দূর থেকে বরফকে শাদা মনে হয়।

উত্তরের ইতিহাসে শাদা ছাড়া কিছু নেই। বুদ বুদ, বুদ বুদ...
আমার মাথার ভিতর খট খট শব্দ হলো। মাথার ভিতর থেকে শব্দদল কানের দিকে যাচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, শব্দের শরীর আমার হাতে ধরা জবাফুল ।

শব্দদল কানের দোরগোড়ায় আসতেই আমি চোখ খুললাম। আমি চোখ খুললাম সূর্যের ভিতর। আমার ঘরভর্তি সূর্য। আমার বিছানা, বালিশ, আধখাটানো মশারির একাংশ কুরে কুরে খাচ্ছে সকালের সস্তা রোদ। শব্দেরা এখন দরজার ওপাশে– খট খট, খট খট...

দরজা খুললাম। চোখ কচলে তাকালাম– বাবা। একহাতে লেবুগাছ, ঠিক লেবুগাছ নয়, লেবুগাছের কলম। আর হাতে টব।
কটা বাজে?
দশটা–টশটা হবে।
মানে কী?
রাতে ঘুমাই না।
ভালো। তোর মা–ও রাতে ঘুমাইতো না।
ভিতরে আসো।
রাতে কী করিস? বাবা ঢুকেই মেঝেতে বসলেন। তার হাতে এখনো লেবুগাছ আর টব।
কিছু করি না। শুয়ে থাকি। এপাশ–ওপাশ করি।
লেবুগাছ নিয়ে এলাম। টবে লাগালেই লেবু হবে। দ্যাখ, ফুল পড়েছে। বাবা মুখ টিপে হাসলেন। তুই চিঠিতে লেবুপাতার কথা লিখেছিলি; তোকে কে যেনো একটা লেবুপাতা দিয়েছে– আর তুই সেটা গীতবিতানের 'আমার নিশীথরাতের বাদলধারা' গানের উপর রেখে দিয়েছিস! তাই নিয়ে এলাম। তোর মা কলম করে রেখেছিলো। লেবু না হোক, বোতলের পানিতে দুইটা লেবুপাতা কচলে দিবি। লেবুপাতারঘ্রাণ লেবুর চেয়ে ভালো।

আমার এখনো স্বপ্নের ঘোর কাটে নি। মনে হচ্ছে বাবা নয়, এখনো সেই বাহারি মাছটাই আমার সাথে কথা বলছে।
যা, মাটি জোগাড় কর।
মাটি কই পাবো? এইখানে ইট আর সিমেন্ট ছাড়া কিছু নাই।
কুমোরপাড়ায় যা, মাটি কিনে নিয়ে আয়। বাবা পঞ্চাশটাকার একটা নোট বের করে দিলেন।
টাকা লাগবে না, আছে।
আরে! নে নে। লাগলে আরো নে। টাকার অভাব নাই। ঘর বেইচ্চা দিছি।
সরল দেহাতি টোনে কথাগুলি বলে যেনো বাবা খানিকটা লজ্জা পেলেন। নতমুখে মুখ টিপে হাসলেন। আমি অবাক হলাম না। আড়মোড় ভাঙলাম।
কই থাকো এখন?
মন্দিরে মসজিদে থাকি। মন্দিরে থাকলে নিজেরে হিন্দু হিন্দু লাগে। আর মসজিদে থাকলে মুসলমান মুসলমান লাগে। তবে মসজিদে শান্তি নাই। শ্যাষ রাইতে মুয়াজ্জিনের বেটা ঘুম ভাঙাইয়া দেয়, অযু করতে কয়। আমি বাইর হইয়া রাস্তায় হাঁটাহাটি করি, ভালাই লাগে। মইধ্যে মইধ্যে শালবনে চইলা যাই, শালপাতার গন্ধ শুঁকি। শুকনা পাতার উপর হাঁটি, মর্মর

বাজে। শালবনের ওপারে ল্যান্ডস্কেপ দেখি। আইচ্ছা, দিগন্তের ওপারেও কি ল্যান্ডস্কেপ আছে?
বাবা থামলেন। আমি চুপ করে আছি, চুপিচাপ। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, দিগন্ত বইলা কিচ্ছু নাই রে, কিচ্ছু নাই...
আমি তার চোখের ভিতর তাকালাম, কেমন খা খা করছে!
তুই ল্যান্ডস্কেপ আঁকিস না?
না।
ক্যান?
ভাল্লাগে না।
কবিতা তো লেখিস, আগের মতো...
আগের মতো না, দুয়েকটা লিখি মধ্যে মধ্যে।
যা, মাটি নিয়া আয়।
তুমি খাইছো কিছু?
হ, খাইছি তো। এইখানে একটা দোকানে ভালা তেহারি বানায়।
আমি চাবির রিং হতে একটা চাবি খুললাম, এইটা রাখো। আমার আসতে দেরি হবে।
বাবা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর সহসা আমাকে দুহাতে বুকের সাথে চেপে ধরলেন। আমি এইবার অবাক হলাম। ছেলেবেলায় কবে শেষবার বাবা আমাকে বুকে চেপে ধরেছিলেন মনে নেই।
একা একা ঘর পাহারা দিতে ভাল্লাগে না। তাই বেইচ্চা দিছি।
কৈফিয়ৎ দিচ্ছো কেনো? তোমার ঘর তুমি বেচবা, সেইটা তোমার ব্যাপার।
গাছগুলার জন্য মায়া লাগতাছে। কতো কষ্ট করে তোর মায়ে গাছগুলারে লাগাইছিলো। কতো আলাইয়ে বালাইয়ে পাশে দাঁড়াইছে...

আমি কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। বাবা অকস্মাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ালেন। কেমন করে যেনো বললেন, ছবি আঁকা ভুইলা গেছি; আমারে ছবি আঁকতে শিখাবি?
বাবার জন্যে ভয়ানক মায়া হলো আমার, হ্যাঁ, শিখাবো।
যা যা, মাটি নিয়া আয়। লেবুগাছটারে আমি নিজের হাতে লাগাইয়া দিয়া যাবো।
আমি চোখে মুখে একটু পানির ঝাপটা দিলাম। তারপর বের হলাম। মোড়ের দোকান থেকে দুইটা সিঙ্গারা কিনে হাঁটতে হাঁটতে খেলাম। বাসে উঠার আগে একটা ডাব কিনে খেলাম। বাসের সিটে বসে বুঝলাম আমার ঘুম পুরো হয় নি।

ঝুমঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। অবিশ্রান্ত বর্ষায় আমি হাঁটছি। একটি মাঠ পার হচ্ছি। মাঠে ঘাসবন। একটুও কাদা নেই। স্বচ্ছ জলে আমি পা ডুবিয়ে হাঁটছি। আমার খালি পা। বৃষ্টির দংশনে আমি ক্রমশ সবুজ এবং সুন্দর হচ্ছি। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে ঘাসবনে বসে পড়েছি আমি টের পাই নি। অভাবনীয় সৌন্দর্য আমাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি। আমি প্রতিটি ঘাসকে আলাদা করে দেখছি। স্পষ্ট শুনতে পেলাম দুইটা দুর্বাঘাস পরস্পর কথা বলছে।

তুই সখি এতো সবুজ কেনো?
তুই এতো হরিৎ কেনো?
সবুজ আর হরিৎ কি এক জিনিশ?
তোর তো চিকন কোমর।
তোর তো কাঁপছে অধর।
তোর চুড়িদার কই?
বর্ষায় কিসের চুড়িদার?
তোর তো গা কাঁপছে।
যাহ্! শিশির পড়ছে।
শিশির না ছাই, বৃষ্টি হচ্ছে।
তোর চোখ তো লেবুপাতা রঙ।
কচি লেবুপাতা রঙ?
যা যা, কাদা নিয়ে আয়।
কাদা দিয়ে কী হয়?
কাদা দিয়ে মূর্তি হয় লো, মূর্তি হয়।
এইখানে তো কাদা নাই।
যা তবে কুমোড়পাড়ায় যা।
কুমোরপাড়া তো বহুদুর, বহুদুর।
এই মাঠ শেষে আর দুইটা মাঠ
তারপর...
তেপান্তরের মাঠ যে দীর্ঘ পথ।
বৃষ্টিতে দীর্ঘপথ পলকেই শেষ হয়।
যাই তবে, যাই।
তোর গায়ে তো লেবুপাতাঘ্রাণ।
তোর চোখের পাতা গীতবিতান...

একটা ঘাসফড়িং আমার হাতের পিঠে এসে বসলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার মনে পড়লো, বাবা আমার জন্যে বসে আছেন। বৃষ্টি থামছে না। ঝমঝম মেঘমল্লার কানে বাজছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে চোখ বুজলাম। আমার চোখের পাতায় বৃষ্টির ছাট লাগছে। চোখের পাতায় কম্পমান চিরদিন জলের কাজল। কী সুন্দর! কী সুন্দর!

ঘাসফড়িংটা মনে হয় হুল ফোটাচ্ছে। মৃদু ব্যথা লাগছে। আমি চোখ খুললাম। বাসের এসিস্টেন্ট ভাড়া চাচ্ছে। ভাড়া দিতে গিয়ে জানলাম আমার গন্তব্য পার হয়ে এসেছে বাস। বেশি দুর না। হেঁটেই যাওয়া যাবে নামলে। আমি নেমে পড়লাম। আর বৃষ্টি শুরু হলো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে হলো মাটির ব্যাগটা ক্রমশ ভারি হচ্ছে। ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালাম যখন– দেখলাম দরজায় তালা। ব্যাগটা একপাশে নামিয়ে রেখে দরজা খুললাম। বাবা কি খেতে গেলেন? মনে হয় না। ঘরে ঢুকে অবাক হলাম; সমস্ত পরিপাটি, গোছানো।

দড়িতে ঝুলানো কাপড় জামা ভাঁজ করা, ইজেল, কালার প্যালেট, রঙের টিউব, ব্রাশ, পেন্সিল প্রতিটি কিছু গোছানো। বিছানার চাদরটা উল্টিয়ে বিছানো। এ কী! বিছানার উপর একটা মোটা খাম পড়ে আছে একপাশে। বুকের ভিতরটা ধক করে উঠলো আমার। খামটা খুললাম, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই-ই, টাকা। গুনলাম। ঘর বিক্রির টাকা।

মেঝেতে একটা ছবি এঁকে রেখে গেছেন, বাবা। দেখলেই বুঝা যায় আনমনে এঁকেছেন। প্যাস্টেল ঘষে আঁকা। ধানক্ষেতের উপর দিয়ে কাক উড়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে দিগন্তে। আমার সমস্ত মূন্য মনে হলো। এইরকম ভিনসেন্টের একটা পেইন্টিং আছে। গমক্ষেতের উপর দিয়ে কাক উড়ে যাচ্ছে। তার ছবিতে সূর্য দুইটা, আর বাবার ছবিতে তিনটা।

ঝাঁপতাল

বৃষ্টি হচ্ছে? তাতে কী!
বলেই সে ঝুমবৃষ্টির মধ্যে নেমে গেলো। হন হন করে হেঁটে গেলো শ্মশানের দিকে। আমি তাকিয়ে আছি। আমি কি তাকে অনুসরণ করবো?

রাত সবে গাঢ় থেকে গাঢ় হচ্ছে। হয়তো দুরে কোথাও পেঁচা ডাকছে। বৃষ্টির শব্দে সে ডাক চাপা পড়ে গেছে। আমিও নামলাম বৃষ্টির মধ্যে। সে আমার বেশ খানিকটা সামনে হাঁটছে। পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না একবারও। আমার মগজের ভিতর এঁকেবেঁকে গজিয়ে উঠছে কবিতার লাইন। কবিতা কি উদ্ভিদ নাকি? নদীর ওপারে রাতে গিয়েছিলাম। গভীর রাতে। তখন ওখানে রাত ছিলো না, ছিলো সকাল সকাল একটা ব্যাপার। ধোঁয়া ধোঁয়া গ্রামের হাটে দেখা হলো মানুষের সাথে। মানুষগুলি আমার মাথার ভিতর ছিলো কখনো। মেক্সিকোতে পিরামিডের চুড়োয় সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে আমি তাকে প্রথম স্পর্শ করেছিলাম। আমার আঙুল ছিলো ধূলির মিনার। ফ্রিদা। সে ছবি আঁকতো নিজে নিজে। সে মাঝরাস্তায় একটি বাসের সামনে পড়ে গেলো, বাস তার ওপর ব্রেক কষলো। বাসের একটা লোহা তার যোনিপথ দিয়ে ঢুকে মেরুদণ্ড ছিন্ন করে বের হয়ে গেলো। তারপর সে শিল্পী হলো। তার ছবি সব পাখি হয়ে উড়ে বেড়ালো। তার সাথে নদী পাড়ে দেখা হলো। সে একটা মনোহরি রোদের দোকান দিয়ে বসেছে। সে আমার হাতে দিলো একজোড়া রোদের নুপুর। সে আমাকে তার পাশে বসতে বললো। আমি কিছুক্ষণ বসলাম। পান খেলাম। চুনটা একটু বেশিই হয়ে গেলো। ফলত আমার ওষ্ঠাধর এমন লাল হলো আমি নিজেই ভয় পেলাম। ফ্রিদা আমাকে একটা মহিশের শিং দিয়ে বললো বাজাতে। আমরা অনেকদিন ওঙ্কার ভুলে গেছি বলে এটা দেখে লজ্জা হলো এবং একটি গুহা আর রাত্রির কথা মনে পড়লো। একটা নদীর ভিতর অনেক নদ ছিলো। প্রচলিত বিশ্বাসে একটি কলস ভেসে ভেসে একটি নালার দিকে গেলো। আমি পানা সরিয়ে নৌকো বেয়ে ও-পাড়ে গিয়ে দেখি রাজাদের গ্রাম। রাজাদের রানিগুলি, রাজকন্যাগুলি সব কোনো ঘাটে ছিলো; তাদের বহন করার জন্যে ঘুরছে সাজোয়া পাল্কিদল। রাজকুমারদের জন্যে ঘুরছে ঝকমারি রিকশা। এইসব বাহনে ফুল, বেগুন, আতর, কিসমিস, মদ আর তামাকে ভর্তি। আমার মনে পড়ে গেলো বিয়াত্রিসের কথা। মনে পড়ে গেলো ইলেকত্রার মুখ। তাদের মুখ ছিলো তামাক রঙ, রোদে পোড়া। ত্বকে রোদের গন্ধে আমি কখনো পাগলের মতো উজাড় করেছি উত্তরের যাকিছু অরণ্য। পানপাতা এসে আমাকে একটি মন্ত্র দিলো; সেই মন্ত্রটিই সকল পথ মুছে দিলো। একটা কান্না এসে আটকে থাকে গলায়, সোনালি কণ্টক। কান্নার রঙ ধু ধু প্রান্তর। একটা কার্নিভাল এসে দুচোখের রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে নীরব। ঝাপসা বলে ঢুকতে গিয়ে হারিয়ে ফেলি আগল। আমার নাম একটি পতঙ্গের নামে হলে বুকের ভিতর লুসিফেরিন আগুন নিয়ে স্পষ্ট করে দিতাম মানুষের উৎসবের দীর্ঘপথ। পথ দীর্ঘ হলে দুরে সরে যায় ক্লান্তির চিহ্ন। তুমি বলেছিলে আমি মানুষ নই– তাই পতঙ্গ হতে ইচ্ছে হলো...

কই যাস?

আমি কেঁপে উঠলাম অচেনা শঙ্কায়। পেছন ফিরে দেখি এক পাগল। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। নিঃশব্দে হাসছে। যেনো আমার চোখের ভিতর তাকিয়ে আছে।
আয় বাজান, আগুনডা নিভাইয়া দে।
কোথায় আগুন?
দেহচ না মোর সারা অঙ্গো আগুন জ্বলে। দ্যাখ, বুকের মইধ্যে দ্যাখ।
পাগলটা আমাকে জড়িয়ে ধরতে আসে; দুহাত বাড়িয়ে বলে, বিষ্টি হইলো কেরাসিন, যতো নামে-- আগুন বাড়ে। সে হাসে, হা হা হা...

বৃষ্টি আরো বাড়ে। আমি পাগলটার কাছ থেকে সরে আসি। কিন্তু সে কোথায়? তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমি হাঁটতে থাকি, আমি হাঁটতে থাকি। তার জন্যে আমার বুকের ভিতর কেমন এক হাহাকার ঘনীভূত হয়। এতোক্ষণে মনে হচ্ছে পাগলটার কথাই ঠিক, বৃষ্টি হলো কেরোসিন। আমি হাঁটছি, আমি হাঁটছি...

তার সাথে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো একটা আর্ট-গ্যালারিতে। একটা প্রদর্শনী হচ্ছিলো। আমারও একটা পেইন্টিং ছিলো প্রদর্শনীতে। শিরোনাম, ডান্স উইথ ডেথ। ছবিটার সামনে সে টানা কুড়িমিনিট দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি কাছে গিয়ে বললাম, এনি থিং রঙ?
নাথিং এল্স। আপনিই আর্টিস্ট?
হ্যাঁ?
ছবিটা আমি কিনবো।
সরি। ওটা বিক্রির জন্যে নয়।
কিন্তু আমি ওটা চাই। এনি হাও।
কেনো? ওটা তো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার মতো নয়; যে কেউ ভয় পাবে দেখলে। এতাক্ষণে বুঝতে পারেন নি!
সে জন্যেই।
মানে!
আমি ওটা নষ্ট করবো। তার চোখে মুখে কেমন এক অস্থিরতা।
আমি অবাক হলাম, হোয়াট্স রঙ?
বললাম তো, নাথিং। বলুন, কতো দিতে হবে।
আমি তো বলেছি...
ওকে। সি য়্যু। বলেই সে বেরিয়ে গেলো। মিনিট দশেক পর যখন ফিরে এলো- তার হাতে একটা ক্ষুর। মুহূর্তেই আমার ক্যানভাসটা ফালি ফালি হয়ে গেলো। ডান্স উইথ ডেথ এর পরিণতিতে কেনো জানি আমার কোনো কষ্ট হলো না। আমার অবচেতন মন কি চাইছিলো ওটার এমন পরিণতি হোক?

ঠিক আটদিন পর। রাত নটা ষোলো মিনিটে সে আমার দরজায় এসে দাঁড়ালো।
আমি আপনার মডেল হবো।
আমিতো এখন আর সামনে মডেল নিয়ে ছবি আঁকি না।

তাতে কী! আঁকেন না তো, আঁকবেন।
ধৈর্যের দরকার।
সে হাসলো। এবার অন্যরকম হাসি। বুঝতে পারলাম না আমি। বললো, আপনার কী ধারণা, আমাকে দিয়ে হবে না?
না, তা নয়। তবে প্রতিদিন আসা-যাওয়া আপনার সমস্যা হতে পারে।
আসা-যাওয়ার ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। এসেছি, কাজ শেষ করেই যাবো।
আমি আশ্চর্য হলাম না। সে ক্ষমতা বোধহয় অনেক আগেই হারিয়েছি। বললাম, কতোদিনের ব্যাপার ভেবেছেন?
একমাস সময় আছে আমার হাতে। একমাস মানে তিরিশদিন। জানেন তো?
আমি ঘরটা একটু গোছালাম। সে হাসলো, গোছাতে গিয়ে তো দেখি আরো অগোছালো করে ফেললেন।
আমি তার খোঁচাটা গায়ে মাখলাম না।
কেমন মডেল হতে চান?
সে তো আর্টিস্টের স্বাধীনতা...
না, আপনি যেমন চান।
তবে বতিচেল্লির যেমন মডেল... আপনি আঁকবেন ভেনাসের জন্ম।

জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। বেরিয়ে যাচ্ছে দরোজা দিয়ে। সে মেঝে থেকে যে সিডিটা তুলে নিলো- তা প্লেয়ারে চাপালে ঘরময় উস্তাদ আল্লারাখা তবলায় তুলবেন ঝাঁপতাল।
আমি ইজেলে ক্যানভাস সাঁটালাম- পাঁচফিট বাই আট। এতোক্ষণে ঘরময় বেজে যাচ্ছে ঝাঁপতাল। বাতাস আর হাওয়া নাচছে পরস্পর।
সে বললো, এবার নাচবে ভেনাস।
ধীরে ধীরে আমার ভিতরকার কুয়াশাগুলি কেটে যাচ্ছে, আর মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতা ফিরে আসছে- আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি, তাকিয়ে আছি...
তার নাচ যখন শেষ হলো- আমার চোখ মাছের চোখ। এই প্রথম আমি তাকে আবিস্কার করলাম নিরাভরণ এবং নিরাবরণ। আর সুন্দর।
আমি ক্যানভাসে প্রথম তুলির যে আঁচড়টা দিলাম তার রঙ...
প্রথমে আমি তার চোখ এঁকেছি। তারপর চুল... ওষ্ঠাধর, চিবুক, গ্রীবা, বুক...
কুড়িদিনের মাথায় শেষ আঁচড়টা দিয়েছি তুলির।
শিরোনাম, দ্য ডান্সিং ফায়ার।

সে শাদাশাড়িটা মেঝে থেকে তুলে দেহে জড়ালো। বললো, যাই।
এই রাতে!
রাতেই তো যেতে হয়। কথাটা কেমন জানি শোনালো।
বললাম, বৃষ্টি হচ্ছে।
সে আমার কথা শুনলো না।

সেই থেকে হাঁটছি আর হাঁটছি। তার দেখা নেই। শ্মশানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গোঙ্গানির শব্দ শুনলাম। দেখি, জনাকয়েক ডোম একজনের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে। একটা শাদাশাড়ি লুটাচ্ছে কাদাজলে। আমি চমকে উঠলাম। এই তো সে! দেখলাম একজনের হাতে ঝলসে উঠছে ছুরি। আমার মুখ থেকে চিৎকার বের হলো নিজের অজান্তে। দুইজন বল্লম হাতে আমার দিকে তেড়ে এলো। ভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম।

তাড়া খেয়ে আমি ছুটছি তো ছুটছি। কতোক্ষণ মনে নেই। ঘুরপথে ছুটছি। আমার পথ ফুরোচ্ছে না। আমার ঘর আর কতোদুর?

বৃষ্টি থেমে গেছে। রাত্রি নিভে গেছে। আমি ছুটছি। পেছনে কি এখনো পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি? পেছন ফিরে তাকালাম। না, কেউ নেই। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। একটা দীর্ঘশ্বাস শেষ হলে দেখলাম, আমার সমুখে ভোর। ভোরের আলোয় বুঝতে পারলাম আমার পথ শেষ। আর কয়েক পা এগোলেই আমার ঘর।

আমার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ঘরের বাঁপাশে গাছগাছালির ভিড়ে বকুলের গাছ। বকুলতলায় কেউ।

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। আর পুনর্বার চমকে উঠলাম। সে। তার পরনে শাদাশাড়ি। শাড়িতে কাদা কিংবা রক্ত কোনোটাই লেগে নেই। আমাকে দেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার আঁচলে জড়ানো বকুল। আমার চোখের ভিতর তাকালো সে– মুঠোভর্তি বকুল আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো। নির্বাক আমি হাত বাড়ালাম।
সে বললো, এর ঘ্রাণ নিতে হয় চোখ বুজে।
আমি চোখ বুজলাম।

চোখ খুললাম যখন– আমার সমুখে, আমার দশদিগন্তে কেউ নেই। মুঠো খুলে দেখি একটাও ফুল নেই।

মুঠোর ভিতর কেবল ঘ্রাণটা আছে।

করাতিয়াক্যাম্প

গভীর বনে একটা করাতিয়া ক্যাম্প আছে। তার দুরগামী চোখ আমাকে গ্রাস করে। আমি করাতকলের দিকে তাকিয়ে থাকি। করাতিয়া দল একদা কাঠ এবং গাছ ছিলো। নপুংসক বনস্পতির ঝাড়ে শুকনো রতিরঙ। আমার ডান কাঁধে বসে বাঁ পাশের প্রহর। প্রহর একদিন করাতের দাঁতে ক্ষয়িষ্ণুশব্দ। ভাবি, করাতের ভীষণ এক দাঁত হয়ে যাই। করাতিয়া আর মৃত্যু যুগলবন্দী নাচ– আমাকে ঘিরে সাজিয়ে চলে অমৃত ক্রন্দন। দেখি, আমার শিকড় বিস্তারিত করেছে বন।

আমি অন্ধকার আকাশের খাতায় নক্ষত্রের দীপ্ত কবিতাগুলি পড়ে পড়ে চোখ ক্ষয় করি, ওরা আমার তিরিশলক্ষ হারানো সজন। আমার মাথায় কোনো গল্প আসে না। দুইদিনের মধ্যে অরুর কাছে গল্প লিখে জমা দিতে হবে। বিজয় দিবসের সংকলন বেরোবে কদিন পর। আর আমার মাথা ফাঁকা। তারপরও গল্প লেখার জন্যে খাতা খুলি, লাইনটা লিখি, 'সে বিছানায় শুয়ে দেয়ালে ঝুলানো কালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে আছে ঘোরলাগা চোখে– আজ ৪ ডিসেম্বর ২০০৪...' তারিখটা লেখার পর মনে হলো আজ আগুনের জন্মদিন। তাকে একটা ফোন করা দরকার। কিন্তু ফোনে ব্যালেন্স নাই।

গল্প কই?
দিবো...
এইবার বিজয়দিবসে তুই কী পাঠ করবি রে?
আমি খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম অরুর দিকে। অরু, অরুন্ধতী ভট্টাচার্য। আমি মনে মনে তাকে আগুন নামে ডাকি। সে জানতে পারে না। চিঠির সম্বোধনে অরুন্ধতী অগ্নি। এখন তাকে বলতে মন চাইছে না যে আমি কবিতা পাঠ ছেড়ে দিয়েছি; সে কষ্ট পাবে। মিথ্যে করে বললাম, কেউ কথা রাখে নি।
শালা! বিজয় দিবসে পড়বি এই কবিতা? আর তাছাড়া তোর বয়স কি তেত্রিশ হয়েছে নাকি?
কবিতাটা আমার প্রিয়। এই কবিতাটা পাঠের কথা উঠলেই অরু বয়সের কথা তোলে। আমি এইবার বললাম, আমার তেত্রিশ হয় নি তো কী হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতার তো তেত্রিশ গেছে...
অরু আনত চোখে চুপিচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো আমার কাছটায় এসে। আমি তার কাঁধে হাত রাখলাম আলতো করে।
ছেলেবেলায় এক বোষ্টুমি তার আগমনী গান হঠাৎ থামিয়ে বলেছিলো শুক্লাদ্বাদশীর দিন অন্ত রাটুকু শুনিয়ে যাবে...
আমার মনে হয় কী জানিস? ওই গানের কোনো অন্তরাই ছিলো না।
আমাদের স্বাধীনতার মতো। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস গুম করলাম।
অরু ভ্রু কুচকে আমার দিকে তাকালো, মানে!
মানে কিছু না। বলে হাসলাম। চল্, চা খাই,তেষ্টা পেয়েছে খুব।
ঝুপড়িতে বসেছি বাইরে। চা খেতে খেতে অরু সহসা হাতের ইশারায় জারুলতলার দিকে কী

যেনো দেখালো। আমি তাকালাম, মুক্তিযোদ্ধা কাজী আব্দুর রহিম হেঁটে যাচ্ছে ফ্যাকাল্টির দিকে। এখানে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই লোকটাকে দেখি প্রায়ই আসে, গলায় তিনটা প্লেকার্ড ঝুলানো। একটা সাহায্যের আবেদন, একটা ইংরিজি বড় অক্ষরে লেখা, ফ্রিডম-ফাইটার। অন্যটা লেমিনেটেড সনদ, নয় নম্বর সেক্টরে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে পেয়েছেন। লোকটা কথা বলতে পারে না। গলায় একটা গুলির দাগ আছে, উরুতে একটা। সে এইসব দাগটাগ দেখিয়ে, যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশলের অঙ্গাভঙ্গি করে ভিক্ষে করে বেড়ায়।
অরু বললো, লোকটার জন্যে মায়া হয়। স্বাধীনতা মানে কী রে?
বললাম, ফ্রিডম ফাইটার আব্দুর রহিম।
না না, আমি সত্যিই জানি না। জানি হয়তো বুঝি না।
অরুকে বাচ্চাদের মতো মনে হলো।
শামসুর রাহমানের কবিতায় পড়িস নি?
কোন কবিতা?
স্বাধীনতা তুমি।
পড়েছি। অরু মনে হলো আমার উত্তরে সন্তুষ্ট নয়।
স্বাধীনতা মানে রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়েরে অবাধ সাঁতার
অবাধ সাঁতার?
অরু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর যেনো ঘোরের মধ্যে চলে গেলো। বলতে লাগলো, অবাধ সাঁতার মানেই তো তিনজোড়া খলচোখ তাকিয়ে আছে আড়াল হতে, ধর্ষক লুকিয়ে আছে পুকুরপাড়ের সঘন বাঁশঝাড়ে, এসিডের বোতল হাতে ঘাটে অপেক্ষমান নরপশু...
আমি তাকে ডাকলাম, অরু, এই অরু...
সে চমকে তাকালো, কী...
ওইসব বাদ দে তো। একটা মজার কথা বলি শোন, জীবনে কখনও দাড়ি না কামালে নাকি স্বর্গে লাইলি-মজনুর বিয়ে খাওয়া যায়...
যাহ্! বোগাস।
জানি তো। এইসব বলতেন, আমাদের স্কুলের নূরুল্লা স্যার, বলার সময় তার কখনো না কামানো দাড়িতে হাত বুলাতেন। থেমে বললাম, নূরুল্লা স্যার রাজাকার ছিলেন।
তুই কেমন করে জানলি?
স্যার নিজেই ক্লাসে বলতো গর্ব করে, আমি রেজাকার ছিলাম, রেজাকার মানে সাহায্যকারি...
ছি!
এইবার আসল মজার ঘটনাটা তোকে বলি, সেদিন টিভিতে দেখলাম স্যার বক্তব্য রাখছেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের এক সমাবেশে। শুনেছি স্যার নাকি এখন সরকারি দলের বিরাট নেতা, মন্ত্রীটন্ত্রি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দেখবি, কদিন পর শর্ষিণার পীরের মতো স্বাধীনতা-পদকও হাতিয়ে বসে আছেন...
আমাকে কথা শেষ করতে দিলো না অরু। অস্ফুটকণ্ঠে বললো, স্টপ ইট!
সে ঘড়ি দেখলো। তারপর তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়লো, যাইরে! আমাকে দেড়টার ট্রেন ধরতে হবে।
কেনো আজকে হঠাৎ...

ঘরে কেউ নেই; মা অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। তুই তো আড়াইটা, না? অরু রিক্শা নিলো। আমি রিক্শাটার চলে যাওয়া দেখলাম। ওর হুটহাট চঞ্চলতা ভালো লাগে। ও এমনই। শুধু একদিন কেমন ধীর এবং নীল হয়ে গিয়েছিলো মুহূর্তের জন্যে। আমরা একদিন বৃষ্টি শেষে সমুদ্রের পাড়ে হাঁটছিলাম, পাড়ের বড়ো বড়ো পাথরে পা রেখে, পাশাপাশি। পিচকি একটা মেয়ে বাদামের ঠোঙ্গা হাতে আমাদের পিছু নিয়েছিলো, বলছিলো, ভাইয়া, ভাবীকে বাদাম কিনে দ্যান না...। আমরা খুব হাসছিলাম, বাদাম কিনলাম। হাঁটতে হাঁটতে সহসা ভেজা একটা পাথরে আমার পা পিছলে গেলো, আমি করে ঠাস করে দুহাতে অরুর কোমর ধরে পতন ঠেকালাম। সাথে সাথে ছেড়ে দিলাম। সে কেমন যেনো হয়ে গেলো মুহূর্তের জন্যে, আমার দিকে কেমন করে তাকালো এক মুহূর্ত! কেমন করে বলি?

তিনচারদিন অরুর দেখা নেই। ক্যাম্পাসে যাচ্ছে না, শিল্পকলায়ও না। পার্টি অফিসেও আসে নি এর মধ্যে। সেলফোনও বন্ধ। ভাবছি ওর ঘরে একবার খোঁজ নেবো। বের হবো এমন সময় রাসেল এসে ঢুকলো, হাতে একগাদা পোস্টারপেপার। বললাম, তুই?
পোস্টার লিখতে হবে।
কেনো?
জানিস না, ভর্তিফর্মের দাম পঞ্চাশটাকা বাড়াচ্ছে? কুড়ি তারিখ হতে তিনশোটাকায় ফর্ম বিক্রি হবে।
শালা! যে হারে বেতন ফি বাড়তেছে, দুইদিন পর আমাগো মতো লোয়ার মিডলক্লাসকে কলেজপাস দিয়ে বসে থাকতে হবে।
এইসবই তো জেনারেল স্টুডেন্টদের বলতে হবে।
ওই যে আইতাছে তোর জেনারেল স্টুডেন্ট।
কবির ঘরে ঢুকলো। রাসেল হ্যান্ডশেক করলো, কেমন আছো কবির?
আমি বললাম, কি রে কবির, হঠাৎ এইদিকে?
চারুকলার নোট দরকার। আমার সামনের মাসে পরীক্ষা।
চারুকলা অনুষঙ্গী নাকি? কিন্তু আমি তো নোটঠোঁটের কারবার করি না, গুরু!
শালা! নোটের সাথে ঠোঁটের কী সম্পর্ক রে?
আরে! আছে আছে।
কথার মধ্যে রাসেল ঢুকে পড়লো, কবির বসো, তোমার সাথে কথা বলি। ইদানীং তো তোমাকে দেখাই যায় না। খুব পড়ছো নাকি?
আমি বুঝতে পারছি রাসেল সিরিয়াস বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাইছে, তাই রসিকতার মাঝখানে ঢুকে পড়েছে। আমি চুপ মেরে গেলাম। কবির বসলো।
জানো তো ভর্তি ফর্মের দাম বাড়াচ্ছে আবার। আমার এর প্রতিবাদে কাল ক্যাম্পাসে মিছিল করবো, ভিসির কাছে স্মারকলিপি দেবো। তুমি থেকো।
না, ভাই। আমি ওইসব পলিটিক্সের মধ্যে নেই, তোমরা করো। আমার পড়াশোনা আছে।
আমার ইচ্ছা হলো কবিরের মুখে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারি। রাগ চাপতে চাপতে বললাম, শালা! পড়াশোনার পরিবেশই নেই, আবার পড়াশোনা।
কবিরের মুখটা একটু ম্লান হলো। রাসেল বললো, হ্যাঁ, কবির, পড়াশোনার পরিবেশ আসলেই নেই। তাই প্রত্যেক স্টুডেন্টের উচিত পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেদের অধিকার

আদায় করা। মনে আছে, আমরা ভর্তি হয়েছিলাম চৌদ্দোশো বারোটাকায়। আর এখন ভর্তি হতে লাগছে চারপাঁচহাজার টাকা প্রায়।
তোমরা রাজনৈতিক ব্যানারে ডাকলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রিরা আসবে কেনো; কমন ব্যানারে কিছু করতে পারো না?
বললাম, তুই করে দেখা না? খালি বড় বড় সমালোচনা। বছরবছর বেতন ফি বৃদ্ধি, সারাবছর স্টুডেন্টদের নানা সমস্যা এইসব নিয়ে তো আন্দোলন আমরাই করি। আর সুবিধা ভোগ করো তোমরা, সো কল্ড জেনারেল স্টুডেন্ট্স। কই, তোরা তো বর্ধিত বেতন-ফি কেউ দিস না। আমরা আন্দোলন করে কমাবো, আর তোমরা ব্যাংকে গিয়ে পুতু পুতু করে টাকা জমা দেবে; শালা!

কবিরের মুখটা ফ্যাকাসে লাগছে। রাসেল বললো, আসলে কবির, ব্যাপারটা হলো অধিকাংশ মানুষই আত্মকেন্দ্রিক, শুধু সমালোচনা করেই গা বাঁচায়? কিন্তু উচিত কি জানো, নিজে কোনো আন্দোলন দাঁড় করাতে না পারলে মন্দের মধ্যে ভালো যেটা তাতে যোগ দিয়ে কাজ করা। ওয়াটএভার, অনেক কথা বলে ফেললাম। কী যেনো নোটের জন্যে এসেছিলে?
রাসেল আমার দিকে তাকালো। বললাম, আমার কাছে নোট নেই কবির, বইটই আছে, নিয়ে যা।

কবির চলে গেলো। রাসেল চুপ করে আছে। বললাম, দেখলি তো, তোর জেনারেল স্টুডেন্ট! সব শালা সুবিধাভোগী। থেমে বললাম, মঞ্জুরিকমিশন নাকি বরাদ্দ কমিয়ে দিচ্ছে?
হ্যাঁ, আস্তে আস্তে দেখবি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সব প্রাইভেট হয়ে যাবে।
এই জন্যেই বাবা বলতেন, স্বাধীনতা পেয়ে কী হলো? পাকিস্তান আর বাঙলাদেশের মধ্যে পার্থক্য তো বোঝা যায় না। বাবা যুদ্ধে একটা হাত হারিয়েছিলেন। সেই হাতের দিকে তাকিয়ে মরার আগ পর্যন্ত এইসব বলে বলে হাহাকার করেছেন।
তোর বাবার কথাগুলি কিন্তু এক অর্থে সত্যি। স্বাধীনতার আগে যে শ্রেণির হাতে ক্ষমতা ছিলো, এখনো কিন্তু সেই শ্রেণির হাতেই ক্ষমতা। তখন তারা ছিলো পাকিস্তানি, আর এখন বাঙলাদেশী। মাঝখানে ত্রিশলাখ প্রাণ ব্যর্থ। তখন বাইশ পরিবার শোষণ করতো, আর এখন করে বাইশহাজার পরিবার। অথবা আরো বেশি।

বাদ দে তো। আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে। অরুর খোঁজ করা দরকার। তুই বরং রুমের চাবিটা নিয়ে যা। প্রবীরকে পাঠিয়ে দে। ও এসে লেখা শুরু করুক। আমি এসে বাকিটা ধরবো। খাটের তলায় রঙ, ব্রাশ সবি আছে।
রাসেল উঠে দাঁড়ালো। বললো, তাড়াতাড়ি ফিরিস। আজ রাতেই কিন্তু শাটলট্রেন কাভার করতে হবে। অরুকে বলিস পোস্টার মারার সময় যেনো থাকে।

অরুর ব্যাপারটা কী কে জানে! ওর মা আরো অসুস্থ হয়ে পড়লো নাকি, মাঝে মাঝে এমন হয়; একেবারে উন্মত্তের মতো আচরণ করে, ভাংচুর করে তখন ঘুমের অষুধ দিয়ে রাখতে হয়। উনি যুদ্ধের সময় স্বাধীনবাঙলা বেতারে মুক্তির গান করতেন। জুন মাসে পাকবাহিনির হাতে ধরা পড়ার পর ছয়মাস কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ছিলেন। উনার সবচেয়ে বড় পরিচয় উনি একজন বীরাঙ্গনা। যুদ্ধের পর অরুর বাবার সাথে যখন বিয়ে হয় তখন উনি প্রাগন্যান্ট। বাচ্চাটা

তিনবছরের মাথায় মারা গেলে উনি দারুণ শক পান। সেই থেকে প্রায় মাঝে মাঝে মেন্টালিডিসঅর্ডার থাকেন।

কোন গেইটে নামবেন মামা?

আমি রিক্শা হতে নেমে পড়ি। দরজা খুলে দেয় নয়না। কেমন বিবর্ণ তার মুখ! নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।
কী হয়েছে তোমার?
অরুর দুচোখ চোখের জলে ভিজে আছে। সে হাঁটতে হাঁটতে খাটে গিয়ে বসলো। আমি তার মুখোমখি বসলাম। তার কাঁধে হাত রাখলাম।
মা মারা গেছে।
কখন?
সে এই প্রশ্নের উত্তর করলো না। বললো, আমার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।
সে তো জানি।
কিন্তু কেমন যোদ্ধা ছিলেন জানি না।
এইসব কী কথা, অরু?
তোকে তো বলেছি আমার এক দিদি ছিলো। তিনবছর বয়সে মারা যায়। আমি মিথ্যে বলেছিলাম, সে মারা যায় নি, তাকে খুন করা হয়েছিলো।
কে? আমি চমকে উঠলাম।
নয়না অস্ফুটে বললো, আমার বাবা।

বিজয়মেলার মঞ্চে বোমা হামলা হয়েছে একটু আগে। ষোলোজন স্পটডেড। আমার মাথা কাজ করছে না। অরুর কথা মনে হচ্ছে। ওর বাড়িটা ওদিকেই। ওর কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু ওদিকে কারফিউ এখন। আমি বের হয়ে গলিপথ ধরলাম। অরুদের বাড়ির সামনে গিয়ে দেখলাম সে গেইটে দাঁড়িয়ে। সে বললো, মনে হচ্ছে ফ্যানাটিকদের কাজ।
আমার মাথা এখনো কাজ করছে না। আমি তার হাত ধরলাম।
অরু, আমার এইসব ভালো লাগছে না। চল্, আমরা এই ধর্মের রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাই।
কী বলছিস তুই, মাথা ঠিক আছে তোর?
হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি তার হাত ধরে টানলাম, চল্, এখনই যাই।
অরু এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলো, এস্কেপিস্টদের মতো কথা বলছিস কেনো?
আমি তখন আরো ক্ষ্যাপা, কী করবি তুই, অ্যাঁ, বোমা হামলার প্রতিবাদে মিছিল করবি; তারপর বোমাহামলার শিকার হবি?
অরু এসে আমার কাঁধে হাত রাখে, তারপর যেনো প্রাণের গভীর থেকে বলে, এই ছাড়া যে আর কোনো পথ নেই রে...

আমি শুধু বললাম, ঠিক আছে; যাই।

ছায়ার ডানা

বাড়ির লোকজন মাকে ঘরের মধ্যে কয়েকদিন আটকে রেখেছিলো। আমি ছেড়ে দিয়েছি, কেননা মা যে খালিঘরে ঘুমপাড়ানিয়া গান করতো– তা সহ্য করার ক্ষমতা আমার ছিলো না। আমি বাড়ির লোকজনের সাথে রীতিমতো ঝগড়া করে ঘরের তালা ভেঙেছি।

মা আমাকে চুপিচাপ ডেকে নিয়ে একটা নারকেলের নাড়ু দিলো। আর আমার মাথার চুলে বিলি কাটলো কিছুক্ষণ। তারপর দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।
সেই থেকে আমার গলায় একটা সমুদ্র আটকে আছে।

প্রিয় মৃগেল, ওগো সরপুটি, চিতল, রুই, বোয়াল তোমরা কি জানো তার ছায়া, তোমাদের কানকোর ভাঁজে কি লুকিয়ে নেই তার নিঃশ্বাস? সে তো গান গাইতো রিমিঝিম, আহা গান আহা গান...
বুদ্ বুদ্ উঠে। আমি এখনো বুদ্ বুদের ভাষা বুঝতে শিখি নি। বুঝি আমার মা ভালোই বুঝতে পারে।
ইদানীং আমি জলের ধারে বসে মনে মনে মাছের সাথে কথা বলি। মাছেরা বুঝি জানে, মাছেরা জানে নিশ্চয়!

আমি চা খাচ্ছিলাম ঝুপড়িতে। হঠাৎ চমকে পাশ ফিরলাম, ভেজা স্পর্শে। মা আমার কাঁধ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত জামাকাপড় জলে ভেজা। কেমন করে তাকিয়ে আছে! কেমন করে বলি? আমি তার হাত ধরে টেনে আমার সামনে বসালাম।
কী হয়েছে মা?
পেলাম নারে খোকা।
পাবে মা।
কখন?
পাবে দেখো।
পাড়ার সব পুকুরে আবারও তো দেখেছি।
কোথাও না কোথাও তো আছে, মা।
সত্যি!
মা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। আমার হাত ধরে ঘুমপাড়ানিয়া গান ধরে এই দুপুরশেষে।
চলো, বাড়ি যাই। কাল সকালে আমিও তোমর সাথে যাবো।
মা উঠে দাঁড়ায়।
আমাদের দীর্ঘ ছায়ারাও উঠে দাঁড়ায় সাথে।

খুকি মরে যাওয়ার পর মা কেমন যেনো হয়ে যায়। একদিন পাথর থাকে। পরদিন খুব ভোর

বেলা বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যায় তাকে খুঁজে পাওয়া যায় মন্দিরের পাশের পুকুরঘাটে, গুনগুন করে গান করছে, আয় আয় খুকির চোখে ঘুম আয়...
খুকি আমাদের পুকুরে ডুবে মারা গেছে। আজ নিয়ে একতিরিশ দিন হলো। মার বিশ্বাস সে মরে নি; জলের ভিতর কোথায় লুকিয়ে আছে, সে জলপরী হয়ে গেছে। আর সেই থেকে মা একটু কাঁদে নি, শুধু পাড়ার পুকুরগুলিতে প্রতিদিন ডুব দিয়ে দিয়ে খুকিকে খুঁজে বেড়ায়।

আমি রাতে ঘুমোতে পারি না বলে সকালে একটু ঘুমাই। বাইরে মনে হয় আমাদের উঠানে হৈচৈ। আমার ঘুম ভেঙে গেলো। দেয়ালঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজে। আজ মা আর আমি বের হওয়ার কথা ছিলো। আমি উঠে দরজা খুললাম। দরজা খুলেই বিষয়টা স্পষ্ট হলো। বকুলতলার দিঘিতে মা নিষ্প্রাণ জলপরী হয়ে ভেসে উঠেছে। আমি দরজা বন্ধ করলাম আবার। কেউ দরজা ভেঙে ফেললেও আমাকে আজ বের করতে পারবে না ঘর থেকে। সমুদ্র, আর কতোদিন মাছের কাঁটার মতো আটকে থাকবে আলজিবে?

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। খুব সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলো। দেখলাম, খুকি আর মা রোদ আর মেঘের জামা পরে আকাশে উড়ে উড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমি তাদের পাশে পাশে একটি ঘুড়ি উড়াচ্ছি।
মা আর খুকি আসলেই পরী হয়ে গেছে। আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি...

কদিন ধরে বাড়ির লোকজন আমাকে বেঁধে রেখেছে। কিন্তু আমাকে তো চেনে না। এর মধ্যেই তিনহাত সিঁদ কেটেছি।

আজ সারাদিন এইখানে রাতের অপেক্ষা করেছি। কিছু খাওয়া হয় নি। অথচ ক্ষিধে নেই। শরীরটা অদ্ভুতরকমের হালকা লাগছে।
এখন আমি পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছি। ঘনায়মান রাতদুপুর। আকাশে দুইটি চাঁদ জ্বলছে। মা আর খুকি উড়ে আসছে। তাদের মুখের হাসিতে উপচে পড়ছে বেহাগ। আমি তাদের সাথে যাবো।
আমি দুহাত বিস্তারিত করছি ধীরে। আমার দুহাতের হাড়ের ভিতর লুকোনো আছে ডানা। কেউ জানে না, কেউ জানে না, কেউ জানে না...

নদীমদ

দুর্বাদল কী যে বাজাচ্ছে, কী যে বাজাচ্ছে! দুইদিন ধরে আমি শুধু কদমফুলের ঘ্রাণ পাচ্ছি। অথচ এইখানে ধারে কাছে কোথাও নীপবন নেই, নীপবনে আষাঢ় নেই। কুয়াশার শাদায় সন্ধ্যা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। বুকের ভিতর টের পাচ্ছি মাইল মাইল দীর্ঘ গানের কান্না।
আমি সমতট পার হয়ে যাই, আমি তারাদের গ্রামখানি বাঁপাশে রেখে নদীপথে হারিয়ে আসি সকালের যাকিছু রঙ।

সন্ধ্যাটা ছিলো ছাইমাখা। সেই অন্ধকারের ছিপছিপে আড়াল হতে টের পাচ্ছিলাম একটি হলুদ হাতছানি। সবগান ভালো লাগছিলো না। তবে লোকটা নাচাতে পারে ভালো। আমি নিজের সাথেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। কেনো দাঁড়িয়ে ছিলাম? গান ভালো লাগছিলো বলে? না। প্রকৃত অর্থে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম একটি কণ্টকসুন্দর হাতছানির মায়ায়, সেই ইন্দ্রজালে আমি জড়িয়ে গিয়েছিলাম আষ্টেপৃষ্ঠে। একটা বৃত্তের ভিতরই ঘুরছিলাম আমার সকল সহজ অস্থিরতা নিয়ে। সেই বৃত্তটির কেন্দ্র একটি সরল হাতছানি। বৃত্ত থেকে বের হবার সাধ্য আমার ছিলো না, সাধও ছিলো না।
আমি নিজের সাথেই দাঁড়িয়ে ছিলাম একটি হিজলের তলে।
একজন এসে বললো, কী, তোমাকে নাচাতে পারছে না?
বললাম, না।

আমি নিশানাথের দোকানের পেছনের ঘরে একদিন সকাল সাড়ে দশটায় হারিয়ে ফেলি আমার কৌমার্য। সে আমার বুকপকেটে তিনটা ভাঙা চুড়ি রেখে চুপিচাপ বেরিয়ে যায়। তার এগারোটা দশে ক্লাস। চণ্ডিদাস। আমি চুলটা ঠিক করে বের হই। দেখি নিশানাথের মেয়েটি রোদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে চায়ের কাপ।
তোমার নাম কী?
অরু।
অরু মানে কী, তরু জাতীয় কিছু নাকি?
না গো দাদা, অরুন্ধতী।
অরুন্ধতী!
কী হলো, দাদা।
তুমি কি জানো স্বাহা একমাত্র অরুন্ধতীর বেশ নিতে পারে নি?
স্বাহা?
স্বাহা অগ্নির প্রেমে উন্মত্ত ছিলো। তাহলে তুমি অরুন্ধতী?
দাদা, এই আপনার চা, দুধ ঠিক আছে কিনা দেখেন।
দুধ!
আমি চায়ের কাপে চুমুক দিলাম।

দাদা, বসি?
হুম!
অরু আমার সামনে বসলো।
অগ্নিস্বাহার কাহিনিটা শুনতে ইচ্ছে করছে।
অগ্নি সপ্তর্ষির স্ত্রীদের প্রেমে মত্ত ছিলো। প্রতিদিন চুরি করে দেখতো তাদের স্নান। আর স্বাহা ছিলো অগ্নির প্রেমে পাগল। তো, স্বাহা করলো কী, একে একে সপ্তর্ষির ছয়জন স্ত্রীর রূপ ধরে অগ্নির কাছে গেলো। এবং মিলিত হলো, অগ্নি ঘুনাক্ষরেও বুঝতে পারলো না। সপ্ত ঋষির একজন ঋষি ছিলেন বশিষ্ট। তার স্ত্রী ছিলেন অরুন্ধতী– সবচেয়ে রূপবতী এবং পুণ্যবতী। স্বাহা তার বেশ ধরতে গিয়ে পারলো না...
দাদা আরেক কাপ চা দিই।
আচ্ছা, দাও। দুধচিনি বেশি।

রাত তখন তিনটা পাঁচ।
ফোনটা রিসিভ করলাম।
হ্যালো!
...
তুমি ভালো আছো?
....
কী বলছো?
...
আচ্ছা।
আমি লাইন কেটে দিলাম। এবং পাথর হয়ে গেলাম।

দুইদিন পর ঝুপড়িতে গিয়েই তার সাথে দেখা। হলুদ জামা। সমুখে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। আর চায়ের কাপে ধোঁয়া। সেই ছাইমাখা সন্ধ্যাটা যেনো ফিরে এলো।
ভালো আছো?
তুমি ভালো আছো?
যাই।
আচ্ছা দেখা হবে।
আমি ঝর্ণার ধারে চলে এলাম। জলে নেমে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলাম।

এককাপ চা বলে আমি নিশানাথের দোকানে ঝিম মেরে বসে আছি। আমি বসে আছি। অথবা দুরে তাকিয়ে আছি। অথবা পাতা ঝরে যাচ্ছে।
চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া এসে লাগলো মুখে। কাপের দিকে তাকাতে দেখি একটি হাতের সাথে সরে যাচ্ছে আঙুলগুলি। কী যে দেখলাম! কী যে দেখলাম! কেমন করে বলি?

ইদানীং নিশানাথের দোকানেই সারাক্ষণ বসে থাকি। ক্লাসের দিকে আগে দুয়েকবার যেতাম এখন তাও যাই না। অরু মাঝখানে দুইদিন বাইরে কোথাও ছিলো। তারপরও বসেছিলাম।
অরু, আরেক কাপ চা।
দিচ্ছি দাদা।
অরু হাতের কাজ সেরে চা রেখে চলে গেলো। আর চায়ের কাপের মধ্যে রেখে গেলো তার দুটি চোখ।

কদিন ধরে ঘুমোতে পারছি না একটুও। বিকেলে একটু ঘুম হয় ছেঁড়া ছেঁড়া। কেবলই কি কৌতূহল ছিলো? আমারও তো ছিলো।

বাইরে অন্ধকার। আমার ক্লান্তি ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। এই শীতে বুকের ভিতর যেনো গলে যাচ্ছে অনন্ত বরফের চাই। আমি তার বিবসন বুকের ভাঁজে চোখ ডুবিয়ে কাঁদছি, অরু অরু...
আর সে ক্রমশ পাথর। আমার চুলের বনে ডুবিয়ে দিচ্ছে কঠিন আঙুল।

প্রিয়তম দুঃখ

বিরহী সিঁদুরের রূপ ধরে জেগে ওঠে অকাল গোধূলি। মেঘ সরে গেলে এইভাবে কিছু ধূলিকণা দৃশ্য হয় গোধূলিবেলার হাওয়ার রথে চড়ে। সে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে ফেলে পরিচিত গাছপালা, পুকুর, লতা, সোনালু, পারিজাত, অকালবৈরী স্রোতাধীর রোদ। তার ডানহাতের মুঠোয় ধরা আছে দিগন্তের রঙ। যেনো বা তার চোখের মধ্যেই নিভে যাচ্ছে সূর্য। সে ভোরবেলা ঘুম ছেড়ে দেখে তাদের কবরের উপর ছায়াবতী বকুলের ডালে বাসা বেঁধেছে দুইজোড়া নাম না জানা পাখি, পাখিরা কান্নার মতো ডেকে উঠছিলো। সে ছুঁতে গিয়ে ছোঁয় নি নীড়; পাখিদের বলেছে, শুভ ভোর, কেঁদো না রাত এলে... ইত্যাদি।

সে চোখে মুখে অনেকক্ষণ পানি দিলো; পানিটা ছিলো তখন জল। ভোরবেলা সমস্ত পানিই জল। সে বালিকাবেলার মতো মুখে জল নিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে কুলকুচি করলো; তার কুলকুচির জল হলো রামধনু। আর সে হলো সূর্যমুখী। বেগুনি-নীল-আকাশী-সবুজ-হলুদ-কমলা-লাল রঙে পরিণত ভোর। একটু পরেই ভোর ধরলো সকালের আধকোমল হাত (মধ্যে মধ্যে তাকে আমার সকাল নামেও ডাকতে ইচ্ছে করে)।

সকাল তাকে নিয়ে এলো একটি ধূসরগেরুয়া রঙ ইস্টিশনে; ওখানে রথের মতো ছাড়ে স্বপ্নযান, কিন্তু সে স্বপ্নযানে না উঠে ভিড় টেলে উঠে পড়ে একখানি ট্রেনে। ইহা শাটলট্রেন নামে আমাদের এবং তাহাদের কিংবা সকলের কাছে পরিগণিত। এই ট্রেন তাকে রোজ পৌঁছে দেয় একটি বেগুনি অরণ্যে। তারপর তার চলাচল। তারপর সে চরাচর।

সে মানে সে। সে মানে তুমি। তার কথা, তোমার কথা এইসব ভেবে রোদ নামে আকাশের রূপবতী স্বেদ। সে তোমাকে চেনে, তার রঙ তোমার দেহের রঙ। সে শরীরে ধারণ করেছে স্বর্ণচাপা। তুমি নির্বাসন, আমি নির্বাসিত; জানতে পারো নি কিছুই। তুমি অভিমান, আমি নতজানু প্রণয়- এইসব প্রণয় প্রলাপ শুনতে পাও না। তুমি টগর- শাদাফুল। তুমি আমাকে বলেছিলে, শাদা ফুল নিজের ইচ্ছায় ফোটে। আর রঙিন ফুলসব ফোটে অন্যের ইচ্ছায়।
আচ্ছা, প্রজাপতি তোমার এতো প্রিয় কেনো? তুমি শুধালে।
প্রজাপতি আমার ভালো লাগে, হাজার হাজার হলুদ প্রজাপতি। এইসব কথা আমি তোমাকে বলেছি বেগুনি অরণ্যে। এই অরণ্য বর্ষার গন্ধে বেগুনি হয়, বৃষ্টির দংশনে সারাটি বর্ষা বেগুনি থাকে। জারুল বৃষ্টির কাছে মর্ষকাম সুন্দর।
আমি কেউ নই নিজের কাছে, আমি কেউই নই তোমার কাছে। আমার স্মৃতি আছে রোমন্থনের জন্যে; সবার আছে, আছে তোমারও।

তোমার স্মৃতি আমি জানি না, সায়ন্তনীল সন্ধ্যা।
এখানে বেশ কয়েকটা পানকৌড়ি ছিলো আগে, ইদানীং দেখা যায় না।
এই কথা তুমি শাটলট্রেনের দরজায় আমার পাশে বসে বলেছিলে। তখনো আমি পানকৌড়ি চিনি না, সত্যি। তারপর একদিন চিড়িয়াখানায় পাখির খাঁচার সামনে ঘুরে ঘুরে পানকৌড়ি চিনেছি; সলিম আলির কাছে জেনেছি পানকৌড়ি পাখিটির আদি অন্ত সুন্দর। এবং পুনর্বার ভুলে গেছি। তুমি আমাকে চিনিয়ে দাও, আমি আর কখনো ভুলবো না।
তুমি আমাকে একটা লেবুপাতা দিয়েছিলো একদিন শূন্য দুপুরবেলা, মনে আছে; ওটা আমি গীতবিতানের দুইশো এগারোপৃষ্ঠায় রেখে দিয়েছি।
আমাদের আলোকবর্ষগুলি এখন পার হয়ে যায় বুকের মধ্যে। তুমি প্রতিদিন পাথরের ভূমিকায় অভিনয় করো, কিন্তু পাথর হতে পারো না। তুমি হচ্ছো সে, সে হচ্ছে তুমি, তুমি দুঃখ, প্রিয়তম দুঃখ।
আমরা আগে কেনো কথা বলি নি?
এই কথা বলে তোমার দুটি চোখ প্রশ্ন হয়ে ছিলো। আমরা পরস্পরকে চিনতাম কিন্তু কথা বলতাম না।
প্রিয়তম দুঃখ, এইসব কথা তুমি আমাকে বলেছো, আমি মনে রেখেছি। তুমি বলে ফেলেছো। ফেলেছো মানে ফেলে দিয়েছো। রেখেছি মানে আমি রেখে দিয়েছি। বুকের তোরঙ্গে রেখেছি বিনীত অরণ্য, স্মৃতিসত্য কুসুম।

তুমি মানে সে। সে সুখের সারাৎসার ঘেঁটে উঠে আসে দুর্বিনীত দুঃখ। সে কাটাপাহাড় ধরে হেঁটে আসে আমার পাশাপাশি। আমরা কথা বলি। আমাদের কথাগুলি ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে। ওটা নীলকান্তপাখি।
সে তাকায় এবং অস্বীকার করে। আমি তাকে একটা কব্জি বের করে দিই, হাতির দাঁতের। আমি তাকে একটা কব্জি বের করে দিই, পোড়ামাটির। ওইসব এখন ডেকোরেশনের কাজে ব্যবহৃত হয়। সে হাত পেতে নেয়।
যত্ন করে রাখতে হবে। আনমনে সে বলে। এবং কব্জি দুইটি ব্যাগে রাখে। আমরা দেয়ালের উপর বসি। সে গান করে, দোলে পলাশের নোলক... ইহা শচীন কর্তা।
পলাশের নোলক দেখতে কেমন?
জানি না।
এটাই তোমার দুধশাদা জামা?
না। তোমার হাতে ভগবদ গীতা!
গীতা সবাই পড়তে পারে।
খেয়েছো?
খেতে চাই।
মান্দার গাছে যে ফুল ফোটে, রক্তের মতো, ওটা পারিজাত। মেঘদুতে লেখা আছে। স্বর্গে মান্দারের নাম পারিজাত।
আমি যা নিজে করি না, তা অন্যকে করতে বলি না।
যথারীতি বৃষ্টি হয় বনাঞ্চলে...

তোমার জন্যে আমার মায়া হয়।
মায়া মানে করুণার ভদ্র নাম, প্রেম যেমন কামের...
তোমাকে আমি করুণা করি?
আমি করুণা চাই না, আমি ছুঁতে চাই সরক্ত।
সে উঠে চলে যায়। আমি উঠে চলে যাই। সে মানে তুমি; আমি মানে আমি– ইদানীং সত্যের মতো সুন্দরের রূপ পরিগ্রহ করি... আর বাঁশিতে বাজে বিলম্বিত লয় বসন্ত।

স্যালাইন বানাবে?
কথাটা তুমি মন থেকেই বলো, কিন্তু নিতে পারো না, সাথে। তুমি যেহেতু সে। আর যেজন সে– তার একটা পরিচিতি এবং সৌজন্যিক পরিমণ্ডল আছে ধূসর প্রতিবেশের মতো, ওখানে আমি বড় বেশি বেমানান, অযাচিত ইত্যাদি। তোমার কাছে প্রধান কথা বন্যার্তদের স্যালাইন দরকার। আর আমার কাছে প্রধান কথা তোমার সঙ্গ দরকার। কিন্তু নৈসঙ্গকে ধারণ করে ছায়ার সাথে কথা বলি জারুলের বনে। আমি পাশ কাটিয়ে চলে গেলে ডাক দিয়ে বলো, অ্যাই! চোখ নেই? দেখতে পাও না!
আমি তোমাকে দেখে আমার দৃষ্টি ফিরে পাই আর তুমি দৃষ্টি হারাও; পাশ কেটে চলে যাও অন্যকাজে। তেইশহাজার ব্যাগ স্যালাইন বানানো দরকার; দেবীদ্বারে পাঠাতে হবে, ওখানে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে...
তারপর এসে বসো মুখোমুখি, চা নাও। আমি আর তুমি গরম চা খেতে পারি না, আমি চায়ের কাপ সামনে রেখে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি, তখন দুপুর। তোমাদের টি কিংবা টিফিন ব্রেক।
কী দ্যাখো?
তোমাকে। না, তোমাকে দেখি না। কী দেখি জানি না।
অস্বস্তিকর।
আমি চুপচাপ। সে আবার অরণ্যে মুভিটার কথা বলে, পুতুলটার মধ্যে ছিলো ইলমাসের প্রাণ...
তার মানে তোমার হাতে ছিলো ঘাসফুল। আমি তাকালাম তৃষ্ণার্ত। তুমি বললে, নট ফর য়্যু। চাই না।
তার হাতে একদিন একটা গোলাপ ছিলো সূর্য। সে বললো, নেবে?
না, আমি ফুল নিই না। মনে মনে বললাম, আমার কাছে ফুল রাখার জায়গা নেই।
সে চলে গেলো। তারপর কোনো এক রাজকুমারের বিচ্ছিরি নাকের কাছে ফুলটা গন্ধহীন কুসুম। হাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহাহ...

অন্য আরেকদিন আসে। সেইদিন পৃথিবী যেনো টগরের মতোই শাদা। সে এসে বসে সমুখে।
আমার কাছে একটা টগরফুল আছে।
কই, দেখি!

তুমি বললে, না, দেখাবো না।
তখনো আমি কোনোদিন টগর চোখে দেখি নি। জেনেছি টগর শাদারঙ ফুল, তোমার হাতের মতো শাদা।
আমি তোমার কাছে একটা চিঠি লিখেছি।

সে নিঃশব্দে হাত পাতলো।

অনেকদিন সে আসে না। অনেকদিন আমি আসি। আর তার স্পর্শ যেখানে যেখানে আছে আমি যাই, ছুঁয়ে দেখি; প্রতিটি কিছু আমাকে তার মতো করে বলে তারই কথাগুলি। আমার কানে বাজে, তোমার চিঠি পড়েছি খুব মনোযোগ দিয়ে... অথবা আমার জিনিশ কই... অথবা ছি! নিজের জিনিশ অন্যের হাতে পাঠাতে লজ্জা লাগে না!... অথবা আমি ওরকম হবো না... অথবা কাজ না করে আমি থাকতে পারি না... অথবা কাজ না করলে আমার ক্লান্তি লাগে... অথবা পরশু তোমার সাথে দেখা হয় নি... ইত্যাদি। আমি পরশুর কথা ভাবতে থাকি। আমার ঘর নেই। আমার খড়ও নেই। শুধু চঞ্চু আছে।
তোমার কাছে চাঁপাফুল?
না, আমার শরীরে তো অন্য এক গন্ধ থাকার কথা...
আমি বিমুগ্ধ বসেছিলাম তার সামনে।
সারাদিন খালি ঘোরাঘুরি রোদে রোদে, খাওয়া-দাওয়া করার দরকার নেই?
আমি চুপিচাপ শুনতে থাকি তার কথা।
অনিয়ম করবে না।
আচ্ছা।
তোমাকে আমি সংস্কৃত ছন্দ শেখাবো।
কখন?
আগে আমি শিখে নিই; তারপর।
সে বলেছিলো এইসব কথা। তার কথা আমার চারপাশে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে কুসুমিত। সে নেই; তার কথা আমার নিঃশ্বাসের বাতাস- আমার শিরায়, উপশিরায়, অলিন্দে রক্তের নদে স্রোতের উপর গান হয়ে বাজে।

একদিন তার মুখোমুখি বসেছিলাম। শাটলট্রেন চলছিলো সন্ধ্যার দিকে। সন্ধ্যার রঙ হরিতকীর ফুল। আর সমস্ত কথা আমাকেই শুরু করতে হয়।
তো, কী প্ল্যান তোমার?
মানে!
ভবিষ্যতে কী করবে ঠিক করলে?
একা থাকবো।
তার এই কথা আমি রক্তের ভিতর শুনতে পাই। আমার শূন্যতার আধার হতে ইচ্ছে করে।
একটা কলেজে মাস্টারি করবো।
আমি শুনতে থাকি। আমার একটা কলেজ হতে ইচ্ছা করে।

সমুদ্রের দিকে কোথাও চলে যাবো...
আমার সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় হতে ইচ্ছা করে। আমি বলি, তার কথা বলো।
ব্যাপারটা হচ্ছে, সেও আমার জন্যে কষ্ট পায়।
আমি মনে মনে বলি, না, প্রিয় দুঃখ, সে তোমার জন্যে কষ্ট পায় না। তবে তোমার সঙ্গ তার ভালো লাগে। যখন তার প্রেমিকা থাকে না সাথে তখন সে তোমার সাথে সময় কাটায়। তুমি ব্যবহৃত হও, না জেনে। আমিও যেমন ব্যবহৃত হই। তবে আমি বুঝতে পারি।
আমার এইসব কথা সে শুনতে পায় না। সে চুপ করে থাকে কিছুকাল। তারপর বলে, আর আমি শুধু শুধু কষ্ট পাই। সে যেনো নিজের সাথেই কথা বলে।

তোমার সমস্ত ভালো না লাগা নিয়ে বাজি আমি অন্তহীন বাঁশি, তুমি ভালো থেকো। তার জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়, ভীষণ কষ্ট। সে দুখানি পা আমার পাশে সিটের উপর রেখে সামনের সিটে বসে আছে। না, একদিন বসেছিলো। ইচ্ছে হলো তার পা ছুঁয়ে দিই। কিন্তু পারি না। তবে মনে মনে ছুঁয়ে দিই ঠিকই। সে টের পায় না।
আমি লিখে দিতে পারি, তোমার মায়ের আগে তুমি মরে যাবে।

এমন কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তাই তার কাছে যাই।
সে বলেছিলো।
তাকে আর খুঁজে পাই না। একদিন তার ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দরজা খুলে গেলো হাওয়ার ধাক্কায়, কেউ নেই ঘরে। তখন সন্ধ্যা ছিলো। সন্ধ্যারতির সময় ধূপের গন্ধে বিহ্বল চারপাশ।
তার মা বললো, সে চলে গেছে।
আমি ফিরে এলাম। দুইদিন পর আবার গেলাম, ভোরবেলা। মা বললো, সে চলে গেছে।
মা যেনো পাথরের ভূমিকায় অভিনয় করছে তারই মতো। তারপরও আমি বারংবার ওর ঘরের অদূরে গিয়ে বালির উপর বসে থেকেছি। মাথার উপর ছায়া মেলে ছিলো সীমাহীন রোদের আকাশ: আমার কল্পনার ভীষণ ছাতিমগাছ। ওর ঘর সমুদ্রের পাড়ে। ঘরের উঠান পার হলেই হাতের বামপাশে কবর, সমাধিবাড়ির পাশ ঘেঁষে বকুলের গাছ। সমাধিবাড়ির পাশে ঠাকুরঘর, জীবাত্মা আর পরমাত্মার সঙ্গমের ঘ্রাণ ওই ঘরে; সে কখনো ওই ঘ্রাণ পায় নি...

প্রতিদিন আমার দিনগুলি কেটে যায় জল, নুন, ফুল, ঠাকুরঘর, কবর, স্মৃতি এইসবের গন্ধ মেখে মেখে। সে আসে না। সে চলে গেছে হয়তো। ওর মা আমাকে দেখে প্রতিদিনই, কিন্তু ডাকে না। আমার একান্নতম দিনে ঠিক করলাম রাতটাও কাটাবো এইখানে। রাত তখন এগারোটা তেরো। মা ঠাকুর ঘরের সিঁড়িতে পা রেখেই আমাকে দেখলো বসে আছি জোছনাপ্লাবিত অন্ধকারে। হাতের ইশারায় আমাকে ডাকলো। আমি প্রণাম করলাম। মায়ের পায়ে চাঁপাবনের গন্ধ পেলাম।
সে আর ফিরবে না। এই কথা বলে মা আমার মাথায় হাত রেখে হিজিবিজি চুলগুলি আরো এলোমেলো করে দিলো। পুনর্বার বললো, সে আর ফিরবে না; তুইই ফিরে যা।

আমি শুনলাম চাঁপাবনের কণ্ঠস্বর মায়ের কণ্ঠে। কিন্তু আমি ফিরবো কার কাছে। আমার তো ঘর নেই।

একদিন ভোরবেলা আমি লঞ্চঘাটে গিয়ে একটি বিশালাকার ইস্টিমারে উঠে পড়ি। তিরিশঘণ্টা ধরে ডেকের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশের সকল তারা, চাঁদ, মেঘ, সপ্ত আকাশ সমস্ত গুনে ফেলেছি, মেঘের ভাঁজে ভাঁজে রাস্তাগুলি জনাকীর্ণ পৃথিবীর মতো মনে হয়েছে। রামধনু গুনেছি– বৃষ্টি বিরতির রাঙা পোস্টার। সেদিন আমাকে ঘিরে আমার চোখে, মুখে, চুলে, বুকে, আঙুলে, নখে সমস্ত সবিশদ শরীরে যতোটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছে ঝরে, ঠিক ততোটাই চুল গুনেছিলাম একদিন তার মাথার এলোমেলো মেঘে। এটা কি তবে কাকতাল? তারপর আকাশে নদীর প্রতিচ্ছদ দেখে গুনেছি এক একটি জল, তার চোখের মতন সরল, আমার চোখের মতন সরল। এইভাবে কেটেছে নদীর সময়, জলের বিহার আমার। তার চোখের তলে আমি দেখতাম একটা সমুদ্র প্রশান্ত, চোখের জলের মতো। কিন্তু তাকে আমি একদিনও বলি নি, প্রিয়তম দুঃখ, তোমার চোখে জল...

শেষবার ওর সমুখে গিয়ে বসেছি।
চা খাবে?
বললাম, খাবো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।
কী দ্যাখো?
আমি চুপিচাপ তাকিয়ে থাকি শূন্যতা।
আমার সত্যিই অস্বস্তি লাগে।
তুমি যখন পথ দিয়ে হেঁটে যাও– গাছপালা, ফুল-পাখি, লতা-গুল্ম, ধুলি-কাকর, বালি যে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে তখন অস্বস্তি লাগে না?
বিশ্বাস করো, এইসব ভাবের কথা আমি সত্যিই বুঝি না।

আমি তার পায়ের তাকিয়ে থাকি নতমুখ দুপুর। সেও গরম চা খেতে পারে না, আমিও পারি না– এতোক্ষণে চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াই।
অভিমান, তুমি সত্যিই দেয়ালের ওপাশে থাকো, স্ফটিক দেয়াল। তোমাকে ঝুঝি না চিলের ডানার অন্তর্গত অস্থিরতা। এইসব মনে মনে বলে তারপর বলি, আমরা এইখানে আর দুইতিনবছর আছি।
হ্যাঁ।
তারপর কী করবে?
এনজিওতে কাজ করার ইচ্ছা আছে।
কিন্তু তুমি তো এনজিওর বিপক্ষে।
কেনো? কিছু এনজিওতো ভালো লাগে।
তুমি ব্যবসা করলে মানাবে। যেমন, প্রকাশনা ব্যবসা।
ব্যবসা করতে টাকা লাগে।

না, তুমি ব্যবসা করলে তো আমাকে একটা চাকরি দিতে পারবে।
চাকরি করবে কেনো? তুমি তো আমার পার্টনার হবে।
কিন্তু আমার তো টাকা নাই।
আমি দেবো। পরে লাভ থেকে কেটে রাখবো। কিংবা না দিলেও চলবে।
আমি মুগ্ধচোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সে হাসে ভোরের প্রথম রোদ।
তাহলে আমি তোমার মুখের দিকে আর তাকাবো না, শুধু পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবো।
আমার পা কাঁথা দিয়ে ঢেকে রাখবো।
কাঁথা মুড়ি দিয়ে শোয়ার পরও মশা যেমন করে কাঁথার ওপর দিয়ে কান খুঁজে বের করে– তেমনি আমার চোখও তোমার পা খুঁজে নেবে...
একটা মোমবাতি নিমিঝিমি, চায়ের দোকানে; একসময় দোকানের সমস্ত চা শেষ হয়ে যায়। সে উঠে পড়ে। আমি উঠে পড়ি। হাওয়া উড়ে জারুলের বনে।

আমি ইস্টিমার থেকে নেমে তাকে খুঁজলাম অভিমান– মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। তাকে খুঁজলাম টগর– শাদাফুল। তাকে খুঁজলাম নির্বাসন– আলোকবর্ষের পথ। তাকে খুঁজলাম দুঃখ– প্রিয়তম; খুঁজলাম চাঁপাবন– গন্ধবহ। তাকে খুঁজলাম সকাল...

এইসব পথ জলের গন্ধে মোহন যাপন। আমি প্রতিদিন হেঁটে হেঁটে তাকে খুঁজে ফিরি শিরীষের ডালে, পাতায় পাতায়, গোলপাতার বনে, কেয়া-নিশিন্দার কাঁটায়, নারিকেলের ছায়ায়, খুঁজে ফিরি ডাহুক, শালিক, কাক, ঘুঘু, মরাল, হরিয়াল, কানাকুয়া, হাঁস আর চিলের উড়ালে, খুঁজে ফিরি শিশিরে, মাঠে, ধানক্ষেতে চিরদিন বাতাসে...
পাই না তাকে, পাই না কিছুই।

অবশেষে তাকে না পেয়ে আমি নিজেই হয়ে যাই শিরীষ, গোলপাতা, কেয়া, নিশিন্দা, ফুল, পাখি, মাঠ, শিশির, অভিমান অথবা আলোকবর্ষের সুদুরতম পথরেখা...

গোপন তোমাকে খুঁজে ফিরি; পাই না কিছুই।

আমি তখন সমুদ্রের পায়ের কাছে কেয়া-নিশিন্দার বন; আমার উদ্ভিদজন্মে নিজেকে চিনতে চিনতে আমার কাঁটায় খুন হয়েছে প্রজাপতিদল, ফড়িং, ছোটোপাখি, ছোটোপাখি...

একদিন জোয়ারের বেলা ভেসে আসে বকুল, গাছসহ। আমি চমকে উঠি– বকুলের গন্ধে।
না, বকুলের গন্ধে নয়; বকুলে আছে চাঁপার গন্ধ।
তোমার কাছে কি চাঁপা ফুল?
মনে আছে বকুলগাছটা ছিলো তাদের কবরের উপর। আর কবর ছিলো অনিবার্য ঘর।
এইবার আমি তাকে বলেই ফেলি, প্রিয়তম দুঃখ, তোমার চোখে জলের কাজল।

হেল্পিংহ্যান্ড

মানিক সাহেব ঘড়ি দেখলেন। ঘড়িতে তিনটা পনেরো। দশটা থেকে এইখানে বসে আছেন তিনি। সকালে দুটা ডালপুরি খেয়েছিলেন মোড়ের দোকান থেকে। ক্ষিধেটা বাড়ছে ক্রমশ। তার সিরিয়াল তেরো। তারপরে আর কেউ নেই। কাকতালীয়ভাবে আজকের তারিখটাও তেরো। আনলাকি থার্টিন। তবে তেরো সংখ্যাটি তার জীবনে কখনো আনলাকি হিশেবে আসে নি। তার প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা তেরো তারিখেই। এটা কাকতাল ছিলো না। এটা ছিলো পরিকল্পিত, আগে থেকেই ঠিক করা। ইচ্ছে করেই তারা তেরো তারিখে ডেট করেছিলো।

বেলের শব্দে মানিক সাহেবের ভাবনাজাল ছিঁড়ে গেলো। তিনি নড়ে চড়ে বসলেন। এখন বারো নাম্বার সিরিয়াল ঢুকলো। এর পরেই তার ডাক পড়বে। তিনি কাগজের বিজ্ঞাপনটাতে আরেক বার চোখ বুলালেন। অস্ফুটে বললেন, হেল্পিংহ্যান্ড।

কী নাম?
মানিক।
ভালো নাম?
মনজুর হোসেন চৌধুরী।
জন্ম?
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।
বাহ্! আপনার নাম তো মানিক না হয়ে স্বাধীন হওয়া উচিত ছিলো। কই, কাগজপত্র দেখি।

মানিক সাহেব সামনে বসা ভারিক্কি চেহারার লোকটিকে হাতের ফাইলটি এগিয়ে দিলেন। লোকটি ফাইল খুলে কাগজপত্র এলোমেলো করে ফাইল বন্ধ করলেন।
পড়াশোনা?
কমার্স গ্রাজুয়েট।
এই চাকরি নিতে আসছেন কেনো?
দরকার, স্যার।
পাহাড়ে উঠার অভিজ্ঞতা আছে?
জি, স্যার।
কতোবার উঠেছেন?
স্যার, কতোবার হিশেব নাই। আমার জন্ম তো স্যার পাহাড়ে...
ইন্টারেস্টিং তো! কিভাবে?
আমার বাবা স্যার ফরেস্টে চাকরি করতেন।
গুড! তাহলে তো আপনার জন্যে কাজ করা সহজ হবে।
জি, স্যার।
ঠিক আছে যান। কাজে লেগে পড়েন। এখন থেকেই পারবেন তো।

জি স্যার।
ওকে, গুড।
স্যার কাজটা কী বুঝতে পারছি না।
না বুঝেই চলেই এসেছেন?
মানিক সাহেব নম্রভাবে হাসলেন, বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিলো আপনাদের একজন হেল্পিংহ্যান্ড দরকার।
হ্যা, হ্যাল্পিংহ্যান্ড। আপনার কাজ একমাসের। একমাসের কাজ একদিনে শেষ করলেও পুরো পেমেন্ট পাবেন। এক সপ্তাহে পারলেও তা, একমাসেও তা। তবে মনে রাখবেন একমাসের মধ্যেই শেষ করতে। এর পরে আপনাকে আর দরকার হবে না।
কাজটা কী, স্যার?
পাশের রুমে যান। আমার সেক্রেটারি আপনাকে কাজ বুঝিয়ে দেবে।

মানিক সাহেব ভেবেছিলেন সেক্রেটারি সুন্দরি কোনো মেয়ে হবে। সিনেমার ভিলেন টাইপ একটা লোক তাকে বসতে বললেন। মানিক সাহেব বসলেন। বসেই মেঝেতে চোখ আটকে গেলো, দশবারোটা ভাঙা গ্লাস পড়ে আছে। মেঝেতে ভাঙা গ্লাস কেনো তিনি ভেবে বের করতে পারছেন না।

তিরিশমিনিট মতো হয়ে গেলো সেক্রেটারি লোকটা তার দিকে একবার তাকিয়েও দেখে নি। কম্পিউটারে ঘটরঘটর করে কী যেনো কাজ করছে। হঠাৎ করে লোকটা তার দিকে চোখ তুলে তাকালো। এবং মৃদু হাসলো। লোকটার হাসি সুন্দর। লোকটা টেবিলের কোণায় রাখা ফ্লাক্স থেকে একটা গ্লাস পূর্ণ করে তার দিকে এগিয়ে দিলেন। বললেন, নেন ভাই, কফি পান করেন।

মানিক সাহেব কফির কাপ হাতে নিতে নিতে নম্রভাবে জানতে চাইলেন, ভাই, আমার কাজটা যদি বুঝিয়ে দিতেন!

সেক্রেটারি লোকটা সহজ ভঙ্গিতে বললেন, আপনাকে একটা খুন করতে হবে।

মানিক সাহেবের হাত থেকে কফির গ্লাস পড়ে ভেঙে গেলো।

এই পাহাড়টা সমতল ভূমি থেকে চারহাজার ফিট উঁচু। হাত দিলেই মেঘ ছোঁয়া যায়। কালোমেঘ, শাদামেঘ, ছাইমেঘ, লালচেমেঘ আরো কতো কতো মেঘ! রামধনুর হাতল ধরে রঙের চাকাও চাইলে হয়তো ঘুরানো যায়। মানিক সাহেবের এখনো তা করতে ইচ্ছে করে নি। তিনি পাহাড়ের প্রান্তে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মন কী এক প্রশান্তিতে ডুবে আছে। সে জানে তার চাকরির মেয়াদ আগামীকাল তিনসপ্তাহ পূর্ণ হবে। তারমানে এই পাহাড়ের উপর মেঘদুত রিসোর্ট এ তারা আছেন তিনসপ্তাহ ধরে। কিন্তু তার এখনো কাজের কোনো অগ্রগতি হলো না। এই নিয়ে অবশ্য তার ভাবনা নেই। সে ভাবছে অন্যকিছু। কেমন

করে এইসব মেঘের উপর পা রেখে রেখে দুরের পাহাড়টার কাছে যাওয়া যায়। তিনি ঘোরলাগা চোখে দুরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মনে হচ্ছে অনেক দুর থেকে তার নাম ধরে কেউ ডাকছে। তার ঘোর কেটে গেলো। তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। আরিফ তাকে ডাকছে।
মানিকদা, আপনি এইখানে! সেই কখন থেকে খুঁজছি আপনাকে।
সরি। কিছু লাগবে?
হ্যাঁ তো! আসেন, ঘরে আসেন, আমাকে কবিতা পড়ে শোনান।
আরিফ মানিক সাহেবকে ঘরে ডেকে নিজেই হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরিয়ে তার কাছে চলে এলো। মানিকদা, আপনি বলছিলেন মেঘের উপর হেঁটে একদিন দুর পাহাড়ে চলে যাবেন। আমি কেমন করে যাবো? আমিতো হাঁটতে পারি না।
প্রত্যুত্তরে মানিক সাহেব কী বলবেন ভেবে পেলেন না। শুধু মৃদু স্বরে বললেন, আমি তো পারি।

যে প্ররোচনায় আমি খুলেছি অক্লেশে
আমি খুলেছি শিকড়ের অতল শিকল
আমি খুলেছি শাদামেঘের ভস্ম বাকল
আমি খুলেছি নদীমুখি রাতের করাত
আমি খুলেছি কারো চোখের কাজল
আমি খুলেছি সপ্তগন্ধ তারার হাসি ও কান্না

আমার হাত আঙুলবিহীন
শিকড় খুলে বুঝেছি কিভাবে গাছবন
বাকল খুলে বুঝেছি মেঘের শুশ্বতা
করাত খুলে বুঝেছি ঘাতকের যন্ত্রণা...

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমা। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিলো। ঘণ্টাখানেক আগে বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন কতো রাত কেউ জানে না। আশেপাশে শাদাকালো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। কখনো চুল ছুঁয়ে যাচ্ছে। ছুঁয়ে যাচ্ছে চিবুক। আরিফ মুগ্ধ হয়ে মানিক সাহেবের আবৃত্তি শুনছে। এই লোকটা চাঁদের আলোতে কবিতা পড়ছে। খাতা দেখে। তার নিজের লেখা কবিতা। অদ্ভুত!

যখন কাজল খুলেছি
কাজল হয়েছে দীঘল রাত্রির অভিমান
অভিমানের অধরে নক্ষত্রের ক্ষত
আর সে রাত্রির দীর্ঘশ্বাস

যে প্ররোচিত করেছিলো
সে কার ছিলো বলে নি তখনো...

শুনতে শুনতে আরিফ অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। তার ভাবনার ভিতর ঢুকে গেলো কালো ছাত আর লাল শরীরের একটা গাড়ি, সমুদ্র, বৃষ্টির ভিতর ছুটে আসা একটা বাস, হাসপাতাল, অষুধের গন্ধ এইসব। সে ভালো করেই জানে মানিক সাহেবের সাথে তাকে এইখানে কেনো পাঠানো হয়েছে, কোন কাজে পাঠানো হয়েছে। সে জানে মানিক সাহেব কাজটা করতে পারবেন না। কিন্তু লোকটাকে কেনো জানি তার খুব সাহায্য করতে মন চাইছে। আরিফ জানে, কোনো হাওয়াবদল নয়। সব ঠাণ্ডামাথায় পরিকল্পিত। এই পরিকল্পনা তার চাচার মাথায় ঘুরছে বছরসাতেক আগে থেকে– তাও সে জানে। সেদিন গাড়িতে তারা সমুদ্রে যাচ্ছিলো, সে, মা, বাবা। বৃষ্টি হচ্ছিলো। আর সামনে থেকে একটা... আহ্, মা!

কী হলো!
কিছু না, মানিকদা। আমাকে একটা শাল এনে দেবেন। বড্ড শীত লাগছে।
মানিক সাহেব উঠে ঘরের দিকে গেলেন।
শাদাটা মানিকদা।

মানিক সাহেব শালটা হাতে বের হয়ে দেখেন হুইলচেয়ারটা ফাঁকা। তার বুকের ভিতর ধক্ করে উঠলো। তারপর এক অভাবনীয় দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন তিনি। তিনি দেখলেন, আরিফ শাদা শাদা মেঘের উপর পা রেখে হেঁটে যাচ্ছে দূরে। দূর পাহাড়ের দেশে। মানিক সাহেব ঘোরের ভিতর চলে গেলেন। এবং নিঃশব্দে আরিফকে অনুসরণ করলেন।